ইন্দু।

উপন্যাস।

শ্রীশৈলেশচন্দ্র মজুমদার
প্রণীত।

কলিকাতা
২০ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট
মজুমদার লাইব্রেরি হইতে শ্রীপ্রফুল্লনারায়ণ রায়
কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

ইন্দু।
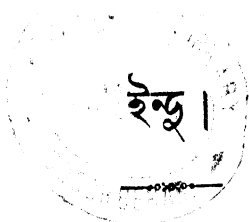
প্রথম পরিচ্ছেদ।

"কিলো আজ তোরা ঘাটে যাবিনে? তোদের যে আর বারই হয় না?"

২য়। কি করি বোন্, এই তোর সইয়ের জন্যই যত দেরি!

১ম। সইয়ের জন্য দেরি কেন?

২য়। ওঁর আর আজ চুল-বাঁধা মনস্তর হচ্ছে না!

১ম। কেন লো সই?

৩য়। দূর্,—তুইও যেমন, বৌয়ের কথা শুনিস্ কেন? বউ, তুমি কিন্তু ভাই ভারি মিচ্‌কতার!

বৌ মৃদু মৃদু হাসিলেন, হাসিয়া বলিলেন "তা সত্যি কথাই ত বল্‌চি ঠাকুরঝি, তোর যে ভাই

পেটে খিদে মুখে লাজ! তা সইকে আর অত লজ্জা কেন?

১ম। কি লা সই?

৩য়। বৌয়ের মাথা!

২য়। আমার মাথাই হোক্ আর মুণ্ডুই হোক্, কথাটা কেন সইকে খুলেই বল না? ওলো, আজ রাত্রে আমার এই ঠাকুরঝি-ঠাকুরাণীর পূজা হবে, তাই আমি প্রতিমাখানিকে যত্ন কোরে সাজাচ্চি!

সম্বন্ধে ননদ ভাজ, তবু উভয়ে বড় ভাব। ঠাকুরঝির সই বলিয়া, কুসুমের সঙ্গেও বৌয়ের বেশ প্রণয়; তিনজনেই সমবয়স্কা, তিনজনেই যুবতী!

কুসুম। পূজো কি লা? নে ভাই ও সব হেঁয়ালি-মেয়ালি রাখ্! কথাটা কি সত্যি বল্ না?

বৌ। আ আমার কপাল, এটাও বুঝ্‌লিনে— আজ যে ঠাকুরজামাই আস্‌বেন!

কুসুম। মাইরি? হ্যালা সই, কই, তুইও ত ও বেলা আমাকে কিছু বল্লি নে? ধন্যি মেয়ে যা' হোক্ কিন্তু! আমার সঙ্গেও লুকো[illegible]!

সই, সইয়ের কথার উত্তর দিতে না দিতে, বৌ

বলিয়া উঠিল, "তা ভাই, বলে নি কি সাধে? কত দিনের পর আজ ঠাকুরজামাই আস্‌চেন, পাছে আবার তোরা এসে রাত্রে সময় নষ্ট করিস্‌! তা, আজ আর তোদিকে ভাগ দেবে না, কাল হ'তে যা হয় করিস্‌!" ঠাকুরঝি একটু হাসিয়া বৌকে চিম্‌টি কাটিয়া বলিল—"মরণ আর কি?"

বৌ। ম'লে বুঝি নিষ্কণ্টক হস্‌?

কুসুম। নে এখন রঙ্গ রাখ্‌। প্রভাতবাবু কখন আস্‌বে, বল্‌ না ভাই? এ খবরটা কি আমাকে বল্‌তেও নেই?

এই বলিয়া কুসুম সইয়ের দিকে চাহিল। মধুর অধরখানি অভিমানে একটু ফুলিয়া উঠিল!

সই ইন্দু এতক্ষণ বৌয়ের সঙ্গে সইয়ের রঙ্গ দেখিতেছিলেন, আর টিপিটিপি হাসিতেছিলেন, কিন্তু সইয়ের অভিমান বুঝিয়া, তাঁর আসন টলিল। ব্যাপারখানা সইকে জানাইবার জন্য ইন্দুর হৃদয়টুকু আকুল হইয়া উঠিতেছিল, কিন্তু মুহূর্ত্তে বৌ-ঠাকুরাণী, এই বিপদ্‌ হইতে ইন্দুকে মুক্ত করিলেন। বৌ আসলে লোকটি মন্দ নন!

বৌ। তা কুসুম, তুই ভাই রাগ করিস্‌নে। প্রভাতবাবু আজ রাত আট্‌টার গাড়িতে আস্‌বেন। তোকে বল্‌বে কি, আমরাই একটু আগে খবর পেলাম। তবে ভাই তোমার সইয়ের মনের খবর রাখিনে, যদি তিনি মনে মনে আগে জেনে থাকেন, তা' এখন তোমাদের সইয়ে সইয়ে বুঝা-পাড়া।

কুসুম আবার সইয়ের দিকে চাহিল, এ চাহনি, হাসি-আহ্লাদে ভরা-ভরা। চারি চক্ষে মিলিল। চোখে চোখে কি কথা হইল জানি না, কিন্তু উভয়ে উভয়ের মনোভাব বুঝিলেন। সহস্র কথায় যাহা প্রকাশ পায় না, সময়ে, একটু হাসি, একটু অপাঙ্গের দৃষ্টি, তাহা বুঝাইয়া দেয়। চুল-বাঁধা শেষ হইল। এবার পরস্পরে সিন্দূর দেওয়ার পালা। সিন্দূর পরান শেষ হইলে, তিনজনে, গামছা কাঁধে, কাপড় কাচিতে বাহির হইলেন।

পথের আশেপাশে ছোট ছোট আম-কাঁঠালের বাগান। মাঝে মাঝে দুই-চারিটা বাঁশঝাড়। জ্যৈষ্ঠ-মাস, বেলা অপরাহ্ণ। পাখীর দল গাছে বসিয়া,

কাকলি করিতেছে। দূরে কোকিল-পাপিয়ার উচ্ছ্বাস পরদায় পরদায় উঠিতেছে। ঘাটে যাইতে যাইতে এই কোকিল-পাপিয়ার ডাক উপলক্ষ্য করিয়া, বৌ ও কুসুম মাঝে মাঝে ইন্দুকে লইয়া নানা রঙ্গ করিতেছিলেন। পথে তাঁহাদের সঙ্গে বামা, রামা, শ্যামা অনেকেরই দেখা হইল। সকলেই এক তীর্থের যাত্রী।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।
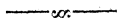
প্রসন্নপুর ক্ষুদ্র গ্রাম। গ্রামের প্রান্তরে 'তাল-পুকুর' নামে একটি পুষ্করিণীর ঘাট বাঁধান। ঘাটের উপর দুই পাশে দুইটি অশ্বত্থ ও বটের গাছ। অনেক তালপুকুরের কথা শুনা যায়, কিন্তু সে সব পুষ্করিণীর চারি ধারে তালগাছের নামগন্ধও নাই। মানুষ যায়, নাম থাকে, সুখ যায়, স্মৃতি থাকে, এই সব পুষ্করিণী বুঝি তাহারই উদাহরণ-স্থল। কিন্তু আমাদের এই পুষ্করিণীর নামের মূলে, কোন ঐতিহাসিক তত্ত্ব নিহিত ছিল না। ইহার চারি ধারে বড় বড় তালগাছের সারি. পুষ্করিণীটি কিছু বৃহৎ, জল বড় পরিষ্কার।

অপরাহ্নে কয়েকটি রমণী গা ধুইতে ঘাটে নামিলেন। জল যেন শিহরিয়া উঠিল। পুষ্করিণীতে পদ্মবন নাই, কিন্তু জলাশয়ের সৌভাগ্য[illegible], দুটি বেলায় অনেকগুলি কমল ইহার বক্ষে ফুটিয়া উঠে।

সদ্যঃপ্রস্ফুটিত এই পদ্মিনীকুলের বর্ণনা লইয়া আমায় একটু গোলে পড়িতে হইয়াছে। ইহার মধ্যে কাহারও বয়স পনেরো বৎসরের অধিক নহে। তবে ইহাদের যুবতী, কি কিশোরী, কি বলিব? কবিগণ ষোড়শীকেই যুবতী বলিয়া বর্ণনা করিয়া আসিতেছেন। কিন্তু কালের স্রোতে সে দিনকাল ভাসিয়া গিয়াছে। বঙ্গললনার যৌবনের নিতান্তই 'অকালবোধন'। এখন যুবতীর বর্ণনা করিতে গেলে, দ্বাদশী বলিয়াই করিতে হয়। তার পর যেন অমাবস্যার দিকে ঢলিয়া পড়ে।

আজ অনেকদিনের পর ইন্দুবালার স্বামী আসিতেছেন, তাই তার সমবয়সীমহলে একটা হুলস্থূল বাধিয়াছে। তামাসার সময় ইন্দু কাহাকেও ছাড়ে না, তাই আজ ইন্দুকে কেন্দ্রীভূত করিয়া এই যুবতীর দল, হাসি-তামাসা-রঙ্গরসে পুষ্করিণীর আসর গুলজার করিয়া তুলিয়াছেন। ইন্দু যে ইহাতে আনন্দ অনুভব না করিতেছে, তা নয়; তবে সে সহসা ধরা দিতে রাজি নহে কিন্তু মনের এ উচ্ছ্বাস চাপিয়া রাখা সরলা বালিকার

কাজ নয়। তার প্রতি কথায়, প্রতি হাসিতে সে আনন্দহিল্লোল খেলিতেছিল।

ইন্দুর অমায়িকতায় সবাই তাকে বড় ভাল-বাসে। আজ তামাসার বেলায় কিন্তু কেহই তাকে ছাড়িতেছে না। সই যে সই, সে-ও আজ থাকিয়া থাকিয়া চোরা বাণ মারিতেছে। ইন্দু মাঝে মাঝে সইকে ভ্রূভঙ্গ করিতেছিল, আর কুন্দদন্তে বিম্বাধরখানি টিপিয়া ক্ষুদ্র হস্তে ক্ষুদ্র কিল দেখাইতেছিল। কিন্তু সই ত আর পুরুষমানুষ নয়! এ সব সে হাসিয়া উড়াইয়া দিতেছিল!

এইরূপে সুন্দরীগণের কাপড়কাচা শেষ হইল। তখন যাঁহাদের জল লইবার প্রয়োজন, তাঁহারা কলসী লইয়া জল পূরিতে লাগিলেন। পূরিবার সময় চারিধার হইতে ছুটিয়া ছুটিয়া নাচিয়া নাচিয়া জল আসিতে লাগিল। তার পর পূর্ণকলসীকক্ষে যুবতীর দল, যখন ধীরে ধীরে গজেন্দ্রগমনে চলিতে আরম্ভ করিলেন, কলসীর জল তখন আনন্দে তালে তালে নাচিতে লাগিল। জল কি সৌন্দর্য্য ভালবাসে? শুনিয়াছি, শতযোজন দূরে,

চন্দ্র দেখিয়া সমুদ্র উথলিয়া উঠে, ইহার সত্যাসত্য প্রত্যক্ষ করি নাই, কিন্তু রমণী-মুখচন্দ্র দেখিয়া কক্ষস্থ কলসীর জল যে উছলিয়া উঠে, তাহা নিতান্ত কবি-কল্পনা নহে।

সহসা এই যুবতীদলের গতিরোধ হইল। বিপরীত দিক্ হইতে আর একদল রমণী, তাঁহাদের সম্মুখীন হইলেন। ইঁহাদের অধিকাংশই যৌবনের শেষসীমায় পা দিয়াছেন। উভয়দলে দুই-চারিটা কথার পর, বয়স্থার দল অগ্রসর হইলেন। কিন্তু "ডাক্তারগিন্নি" তখনও নবীনাদলের সহিত কথা কহিতে রত! ডাক্তারগিন্নি—ডাক্তার হরকালী বন্দ্যোপাধ্যায়ের দ্বিতীয়পক্ষের স্ত্রী। সমবয়সীমহলে তিনি 'ডাক্তারণী' বলিয়া পরিচিতা। ডাক্তারগিন্নির বিলম্ব দেখিয়া, তাঁর দলের একজন তাঁকে ডাকিয়া বলিলেন, "বলি, ও ডাক্তারণী, তুই যে দেখি, সিং ভেঙে বাছুরের দলে মিশ্লি!" ডাক্তারগিন্নি তখন নাত্নীদের সঙ্গে রঙ্গরসে মগ্না, হাসিতে হাসিতে উত্তর দিলেন, "সিং ভাঙ্তে হবে কেন লো, আমি যে নেড়ি, তা তোরা না হয় একটু

আগে যা, আমি যাচ্ছি।” এইখানে ডাক্তারগিন্নির আর একটু পরিচয় দিয়া রাখি। তিনি নিঃসন্তান, কিন্তু সেজন্য তাঁর কোন অশান্তি নাই। সেই স্বামিসোহাগিনী,—সদাই হাস্যময়ী, সদাই প্রফুল্ল! লেখা পড়াও তাঁর মোটামুটি জানা আছে। রামায়ণ, মহাভারত, অন্নদামঙ্গল, চণ্ডীদাস প্রভৃতি তাঁর একরূপ কণ্ঠস্থ বলিলেই হয়। নবীনাদলের অধিকাংশই তাঁর নাত্নী বা নাত্বৌ। ঠাকুরাণী-দিদি কিন্তু কেবল এই সম্বন্ধেই সন্তুষ্ট নন, নাত্নী বা নাত্বৌদের সঙ্গে তিনি কত রকমের কত নূতন নূতন সম্বন্ধ পাতাইতেন। ইন্দু তাঁর “সাধের বাগান”, আর ইন্দুর সই কুসুম হচ্চেন তাঁর “আতরদানি”, তা ছাড়া কেহ “দেখনহাসি”, কেহ “মাইডিয়ার্”, কেহ “লেবেন্ডার”, কেহ বা ‘ওডিকলম”, কেহ বা “চোখের বালি”। নাতীর দলে বিশেষত নাত্জামাই-মহলেও তাঁর কম পসার নয়। ডাক্তার-গিন্নি ইন্দুকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, “কি লো সাধের বাগান, আজ নাকি মালী আস্চে? আমি ত ভাই ভাব্ছিলাম—ফুটিয়ে

কলি, পড়্ছে ঢলি, কই ত অলি এলো না!' তা এতদিনে বুঝি তার মনে পড়েছে। কাল গিয়ে মালিগিরি ঘুচিয়ে দিয়ে আস্‌ব।" ইন্দু নতমুখে একটু হাসিল, সই কিন্তু ছাড়িবার পাত্র নয়। সে ঠাকুরাণীদিদির কথার ছল ধরিল, "সইয়ের মালি-গিরি ঘুচিয়ে দিয়ে নিজের মালী ক'রে নেবে বুঝি আতরদানি? তা হলে যে ডাক্তার-ঠাকুর-দাদাতে আর প্রভাতে চুলোচুলি বেধে যাবে গো?" ডাক্তারগিন্নিও বড় সোজা নন, বলিলেন, "দূর নেকি, তোর ঠাকুরদাদার ত তা' হলে ভালই হবে। পুরাণ বাগান গিয়ে তার আবার নূতন বাগান হবে, সঙ্গে সঙ্গে ফুটন্ত কুসুমকলিটিও পাবে।"

কুসুম। না গো না, আতরদানি! সাজান বাগান ছেড়ে দিয়ে কেউ কি আর নূতন বাগান চায়?

ডাক্তারগিন্নি। আ মর্! ঐ দেখ্,—রোগী মেরে, ঘোড়ায় চড়ে', আস্‌চে আমার বর!

বাস্তবিক, দূরে ডাক্তারবাবু ঘোড়া ছুটাইয়া আসিতেছিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া নবীনার দল

তাড়াতাড়ি চলিয়া গেল! ডাক্তার-ঠাকুরদাদার সাম্‌নে পড়লেই ত সর্ব্বনাশ! এখনি কি না কি বলে বস্‌বে। ঠাকুরাণীদিদিটিও হাসিতে হাসিতে মরালগতিতে চলিয়া গেলেন। যাইতে যাইতে একবার একটু ফিরিয়া বলিলেন,—"কাল দুপুর-বেলায় যাব লো বাগান। তোর তো ভাই, এখন পাথরে পাঁচ কিল!"

এইরূপে আমোদে-আহ্লাদে কাটাইয়া সকলে আপন আপন গৃহে ফিরিলেন। পল্লিগ্রামের রমণীগণ, বিশেষত যুবতীর দল, এই উপলক্ষ্যে দিনান্তে একবার একত্র হন। এ সময় তাঁহাদের বড় সুখে কাটে। প্রণয়ী যেমন প্রণয়িনীর মিলনের আশাপথ চাহিয়া থাকেন, চিরপ্রবাসী বাঙালী যেমন শারদীয়া পূজার ছুটির অপেক্ষা করেন, বালিকা বধূ যেমন পিত্রালয়ে যাইবার দিন গণিতে থাকেন, ইঁহারাও বুঝি সেইরূপ সতৃষ্ণনয়নে, একাগ্রমনে এই সময়টুকুর প্রতীক্ষা করেন।

ক্রমে সন্ধ্যা অতীত হইল, গৃহে গৃহে দীপ জ্বলিল, ইন্দুর হৃদয়ের আশার দীপও জ্বলিয়া উঠিল।

সারাটি বৎসর ধরিয়া, ইন্দু স্বামীর আশাপথ চাহিয়া আছে। ইহার পূর্ব্বে সে স্বামীর সহিত ভাল করিয়া কথা কহিতে পারিত না, আজ কি পারিবে?

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

—*—

ঠিন্ ঠিন্ ঠিন্ শব্দে সহসা ইন্দুর ঘুম ভাঙিয়া গেল। কিন্তু ঘুমের ঘোরে সে শব্দটা যে কিসের, তা' বড় 'ঠাওর' করিয়া উঠিতে পারিল না। তাড়াতাড়ি স্বামীর শিথিল বাহুপাশ হইতে আপনাকে মুক্ত করিয়া, উঠিয়া বসিল। অসংযত বেশ, আলুথালু কেশ একটু সংযত করিয়া লইল। তখন নিদ্রালস চক্ষু মুছিতে মুছিতে মুক্তবাতায়নপথে দেখিল, সবেমাত্র ভোর হইয়াছে। তবু রক্ষে! সে ত ভেবেছিল, না জানি কত বেলাই বা হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে ঠাকুরাণীদিদিদের বিদ্রূপের দারুণ বিভীষিকাও বুঝি তার মনে জাগিয়া উঠিয়াছিল।

আর বুঝি মনে হইতেছিল—

"রজনী না যেতে, জাগালে না কেন,
বেলা হল মরি লাজে।
সরমে জড়িত, চরণে কেমনে
চলিব পথের মাঝে ॥"

ঘর হইতে যাইবার পূর্ব্বে, এই সুযোগে নিদ্রিত স্বামীকে একবার ভাল করিয়া দেখিবার লোভটুকু ইন্দু সংবরণ করিতে পারিল না। রাত্রিতে লজ্জায় সে ভাল করিয়া স্বামীর মুখের দিকে চাহিতে পারে নাই। এখন স্বামীর অজ্ঞাতে ইন্দু অনিমেষে সে মূর্ত্তি দেখিতেছিল। দেখিতে দেখিতে দেখিল, কপালে তাঁর বিন্দুবিন্দু স্বেদ ঝরিতেছে। ইন্দুর বড় সাধ হইল, ঘাম মুছাইয়া একটু বাতাস করে, কিন্তু কেমন বাধ-বাধ ঠেকিতেছিল—"কি জানি যদি ঘুম ভেঙে যায়, তবে ত ধরা পড়্‌ব, ছি!"—এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে যেন কতকটা আপনার অজ্ঞাতেই ইন্দু ধীরে ধীরে স্বামীর কপাল মুছাইতে লাগিল। বাঁ হাতে, পাখাখানিও তুলিয়া লইল। কোমল অঙ্গুলীর কোমল স্পর্শে প্রভাতের ঘুম ভাঙিয়া গেল, অমনি চারি চক্ষে মিলিল। ইন্দুর হাত হইতে পাখা পড়িয়া গেল। সে তখন লজ্জায় জড়সড় হইয়া মুখখানি নীচু করিল। প্রভাত সেই ব্রীড়ানত মুখখানি দেখিবার জন্য ইন্দুর চিবুক ধরিলেন,—ঠিক সেই মুহূর্ত্তে কে যেন আবার ঠিন্ ঠিন্ ঠিন্ শব্দে

বাহিরে শিকল নাড়িল। ইন্দু লজ্জাবনত নয়নপল্লব-দুটি স্বামীর পানে একটু তুলিয়া বলিল—"এখন তবে যাই।"

কপাট খুলিয়া ইন্দু দেখিল, সে যাহা ভাবিয়াছে, ঠিক তাহাই বটে। সম্মুখে হাসিমুখে দাঁড়াইয়া সই! পোড়ারমুখী সই নইলে, রাত পোয়াতে না পোয়াতে এত মাথাব্যথা আর কার? ইন্দু বাহিরে আসিলে সই একমুখ হাসিয়া বলিল, "কি গো!" তখন দুই সইয়ে হাতধরাধরি করিয়া নিভৃতে চলিল।

দেখিতে দেখিতে বৌ এবং আর আর সমবয়সীরা আসিয়া জুটিতে লাগিল, ক্রমে—

"শ্যামলা বিমলা, মঙ্গলা সরলা,
আইলা ইন্দুর পাশে।
যদি স্বতন্তরে, তথাপি ইন্দুরে,
পরাণ অধিক বাসে॥
ইন্দুমুখ দেখি, হৈয়া মহাসুখী,
কহয়ে কৌতুককথা।

রজনী-বিলাস, শুনিতে উল্লাস,
অমিয়-অধিক গাথা ॥
হাস-পরিহাসে, রসের আবেশে,
মগন হইল ইন্দু।
সে নিশি-কাহিনী, রস-নির্ঝরিণী,
কবি মাগে এক বিন্দু ॥

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

দিব্বাবৈঠকে মধ্যাহ্নে প্রভাতের অন্তঃপুরে ডাক পড়িল। প্রভাত ঘরে গিয়া দেখেন, কুসুমপ্রমুখা সখীর দল ইন্দুকে ঘিরিয়া বসিয়া আছে। প্রভাত গৃহে প্রবেশ করিলেন, কিন্তু কৈ, কেহ ত কিছু বলে না! সকলেই অন্যদিকে চাহিয়া আছে; যেন তাঁহাকে কেহ দেখে নাই! প্রভাত কিছু গোলে পড়িলেন, বুঝি একটু অপ্রতিভও হইলেন। এই সময়, ইন্দু একবার, সখীদের লুকাইয়া, স্বামীর পানে চাহিল, তাহার মধুর অধরে একটু মধুর হাসি খেলিল! প্রভাত ব্যাপার বুঝিলেন, বলিলেন—"আসামী হাজির।" কিন্তু তবু কোন উত্তর নাই, কেবল ইন্দু, আর একবার তেমনই হাসিয়া চাহিল,—প্রভাত পুনশ্চ বলিলেন,—

"তলব হ'য়েছে কেন রাইয়ের দরবারে ?"

এবার কুসুমের মুখ ফুটিল,—"তুমি গরহাজির, তাই [illegible] কাছে, মান বাদী হ'য়েছে!"

প্রভাত। তলবমাত্র ত হাজির হয়েছি।

কুসুম। তলব করতে হয় কেন? তা অতশত বুঝিনে, এখন মান ভাঙ।

প্রভাত। কেমন ক'রে ভাঙ্‌তে হবে?

কুসুম। "তা আমি কেমন ক'রে বল্‌ব? আমি কি পুরুষমানুষ? এ ত তোমাদেরই কাজ, ঐ দেখ।" বলিয়া দেওয়ালের একখানি ছবি দেখাইয়া দিল—প্রভাত দেখিলেন—মানভঞ্জনের ছবি—তার নীচে ছাপার অক্ষরে লেখা—"দেহি পদপল্লবমুদারম্‌।" প্রভাত একটু হাসিয়া বলিলেন,—"তোমরা সব সখী মিলে তাল ফলালে তিলগাছে, মানের সাগর প্রবল আমি কেমনে কেলি ছেঁচে!"

সকলে হাসিয়া উঠিল। কুসুম হাসি থামাইয়া বলিল, "কেন, তোমার কি কোন দোষ হয়নি নাকি? এতদিন ভুলেছিলেন, সেটা বুঝি অপরাধ নয়! সই যেই সই, তাই অল্পে ছেড়েচে!"

প্রভাত। আর তুমি হ'লে?

কুসুম একটু অপ্রতিভ হইয়া ভ্রূকুটি করিয়া—

"আহা কি কথাই বল্লেন আর কি?" বলিয়া সইয়ের দিকে চাহিল। বলিল, "মিন্সের আক্কেল-খানা দেখ একবার।" সই একটু হাসিল।

তার পর সে শুকশারীর দ্বন্দ্ব মিটিয়া গেল। ইন্দুর অনুরোধে কুসুম কপাট বন্ধ করিয়া আসিল—পাছে কর্ত্তামা, কি আর কেউ, ঘরে আসে। তা হ'লে ত বড় অপ্রতিভ হ'তে হবে।

এতক্ষণ কুসুম একলা আসর রাখিয়াছিল, দোর বন্ধ করার পর, বৌ-ঝি সবাই এখন নিশ্চিন্ত হইয়া কুসুমের সহকারিণীরূপে বাক্‌যুদ্ধে যোগ দিল। মহারথী হইলেও সপ্তরথি-বেষ্টিত অভিমন্যুর মত প্রভাতকে এ যুদ্ধে কিছু বিব্রত হইতে হইল!

ধম্, ধম্, ধম্, কে দরজায় ধাক্কা দিল। ধাক্কা, ধাক্কা, ধাক্কার পর ধাক্কা, সে ধাক্কা আর থামে না—ইন্দু জিভ্ কাটিয়া, একহাত ঘোমটা টানিয়া, এক কোণে লুকাইল, বৌর দলও যেন কিছু শশব্যস্ত হইয়া উঠিল। কুসুম তাড়াতাড়ি দরজার নিকট আসিয়া হাঁকিল—"কে গা?" বাহির হইতে কে

উত্তর দিল, "বলি তোরাই কি একলা-একলা রাস-লীলা করবি—বুড়ীকে কি নিবিনে ?" ও হো, এ যে চেনা গলা। সকলে চিনিল, ডাক্তারঠাকরুণ-দিদি—তবু রক্ষে !

'এস এস চন্দ্রাবলি দিদি এস,' বলিয়া কুসুম দরজা খুলিয়া দিল। হাসিতে হাসিতে ডাক্তার-গিন্নি গৃহে প্রবেশ করিলেন—প্রভাত, খাট হইতে নামিয়া, ঠাকুরাণীকে প্রণাম করিলেন। ঠাকুরাণী আশীর্ব্বাদ ও কুশলাদি জিজ্ঞাসা করিলে প্রভাত বলিলেন, "বাগানের যে এত দেরী।"

ডাঃ গিঃ। "আর ভাই, আমাদের ভাঙা বাগান, এখন আর জোগান দেওয়া ভার!" তার পর ইন্দুর দিকে চাহিয়া, "ও কিলো 'বাগান', আমার কাছে এত লজ্জা কেন? এলো লজ্জা রাখ্" বলিতে বলিতে তাহাকে ধরিয়া আপনার কাছে আনিলেন। ইন্দু জড়সড় হইয়া, ঠাকুরাণী-দিদির কাছে ঘেঁসিয়া বসিল। প্রভাত, ঠাকুরাণী দিদির অনুমতি ক্রমে আবার স্বস্থানে গিয়া বসিলেন। তখন, ডাক্তারগিন্নি, কুসুমের দিকে চাহিয়া

বলিলেন, "হ্যাঁলা আতরদানি, আমাকে ডেকে আন্‌তে নেই কি? তোরা গেলিনে দেখে আমি শেষ গন্ধে গন্ধে এলাম!" প্রভাত হাসিয়া বলিল, "ঠান্‌দিদির ঘ্রাণশক্তিটা বড় প্রখর ত।" ডাক্তার-গিন্নি একটু চাপা হাসি হাসিয়া বলিলেন, "তুমি যখন এসে বাগানে পড়েছ, তখন আমি না এলে কি আর রক্ষা ছিল!"

প্রভাত বুঝিলেন, উত্তর উপযুক্ত হইয়াছে।

ডাক্তারগিন্নি বলিয়াই চলিলেন, "তুমি ত ভারি নিষ্ঠুর, এতদিন কি ভুলে থাক্‌তে হয়। পাট অভাবে, আমার সাধের সুন্দর বাগান যেন শুকিয়ে উঠেছে! তুমি কি রকম মালী? মালী উপস্থিত না থাক্‌লে ফুটন্ত বাগানের কি দশা হয়, তা কি জান না?"

এবার ইন্দু ঠাকুরাণীদিদির দিকে ভ্রুকুটি করিল। প্রভাত বলিলেন, "ওজন্য ত এতক্ষণ অনেক 'খোঁটা' খেলাম।"

ডাঃ গিঃ। খোঁটার এখন হয়েছে কি?

প্রভাত। তা বটে! যে রকম দেখ্‌ছি, তাতে

কেবল খোঁটার পার পেলে বাঁচি, আর কিছু খেতে না হয়।

সকলে হাসিয়া উঠিল, ইন্দুও মৃদু হাসিল, তার পর, ঘোম্‌টার ভিতর হইতে একটু কোপকুটিল কটাক্ষে একবার স্বামীর পানে চাহিল। ডাক্তার-গিন্নি আবার বলিলেন, "দেখ নাত্‌জামাই, একটা মজা শুনেছ! ও মাসে তুমি ত ভাই, আস্‌বো বলে এলে না, ইন্দুর যে দুঃখ! একদিন দেখি, হেমকে আর শৈলকে ইন্দু শ্লোক শেখাচ্চে; সে শ্লোকটা কেন শেখাচ্ছিল, তুমি শুন্‌লেই বুঝ্‌বে এখন।" বলিয়া ডাক্তারগিন্নি দরজা খুলিয়া বাহিরে গিয়া শৈলকে ধরিয়া আনিলেন। হেম পলাইয়া গেল। শৈল ইন্দুর জ্ঞাতি-ভগ্নী, তারাও সব দল বাঁধিয়া উঁকিঝুঁকি মারিতেছিল। শৈলকে ধরিয়া আনিয়া ডাক্তারগিন্নি বলিলেন, "বল্‌ ত শৈল—সে দিন তোর ইন্দুদিদি যে শ্লোকটা শেখাচ্ছিল, সেটা বল্‌ ত? পুতুল আর পুতুলের গয়না দেব এখন।" ইন্দু হাত নাড়িয়া, ঘোম্‌টার ভিতর হইতে চোক পাকাইয়া শৈলকে বারণ করিল—কিন্তু সে পুতুল

পাওয়ার লোভ পাইয়াছে, নিষেধ শুনিবে কেন? শৈল তখন হাঁফাইতে হাঁফাইতে আধ-আধ কথায় বলিতে আরম্ভ করিল—

"বালিকা ছিলাম, ছিলাম ভাল সই ;
ছিল না সুখ-অভিলাষ।
পতি চিন্‌তাম না, ও রস জান্‌তাম না,
হৃৎপদ্ম ছিল অপ্রকাশ।
এখন সেই শতদল মুদিতকমল, কাল পেয়ে ফুটিল,
পদ্মের মধু পদ্মে রেখে ভৃঙ্গ উড়ে গেল।
একে"——

আর বলা হ'ল না। ইন্দু আসিয়া শৈলর মুখ চাপিয়া ধরিল! আর কাণে কাণে কি বলিল—শৈল "আচ্ছা" বলিয়া ছুটিয়া পলাইল। ডাক্তারগিন্নি বলিলেন,—"ওকে তাড়িয়ে দিলি কেন লো বাগান? এখন আবার এত লজ্জা কেন?"

তার পর অন্য কথা পড়িল। এদিকে বেলা যায় যায় দেখিয়া ক্রমে আসর ভাঙিতে আরম্ভ হইল। তখন প্রভাতের জলখাবারের ডাক

পড়িল। প্রভাত উঠিলেন। আসুন, আমরাও আজ এইখানে বিদায় গ্রহণ করি।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

"জোর্-সে হাঁকাও" প্রভাত বারংবার কোচ্-ম্যান্‌কে তাড়া দিতেছেন। আজ আট্‌টার ট্রেণ ধরিয়া এগারটার পূর্ব্বে আফিস যাইতেই হইবে, নতুবা—সহসা প্রভাতের মানসচক্ষে বড়-সাহেবের রোষ-রক্ত বদনমণ্ডল উদিত হইল, প্রভাত তখন ব্যাকুলভাবে দ্বিগুণ আগ্রহে আবার হাঁকিলেন. "জল্‌দি হাঁকাও।" বক্‌সিসের লোভে কোচ্‌ম্যান্ চাবুক হাঁকড়াইয়া কিছু জল্‌দি হাঁকাইতে লাগিল সত্য, কিন্তু অশ্বের বেগ তাহাতে বড় বাড়িল না; প্রভাত উৎসুকনয়নে ঘড়ি খুলিয়া, ষ্টেসনের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া চাহিয়া কেবল আফিসের চিন্তাতেই আকুল হইতেছিলেন, এমনসময় পশ্চাৎ হইতে কোন গাড়ির রসিক গাড়োয়ান গাহিয়া উঠিল,—

"বিরহিণী বিবি আমার বাঁধে নাকো চুল!"

এ সঙ্গীতে প্রভাতের হৃদয় যেন স্পন্দিত হইল। সেই বিদায়ের দৃশ্য, ইন্দুর সেই ছলছল জলভরা আঁখি-দুটি, যেন তাঁর সম্মুখে ভাসিয়া উঠিল।

ইন্দু যে তাঁকে আর একটি দিনের জন্য থাকিতে অনুরোধ করিয়াছিল, কিন্তু প্রভাত, বালিকার সে আব্দার রক্ষা করিতে পারেন নাই। সহসা প্রভাত বড় অন্যমনস্ক হইলেন, আফিস, সাহেব, মুহূর্ত্তে সব ভুলিয়া গেলেন। ইন্দুর স্মৃতি, হৃদয়সিন্ধু উদ্বেলিত করিয়া দিল।

কবি বলিয়াছেন, জীবন অস্থায়ী, ইহা দুঃখের বটে, কিন্তু অধিকতর কষ্টের কথা, জীবনের উপ-ভোগ্য সুখের দিন আরও ক্ষণিক! এ উক্তির সত্যতা প্রভাত আজ মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝিতেছিলেন। হায় দাসত্ব! আবার দাসত্ব,—প্রভাত তখন ঘড়ির দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া আকুলভাবে আবার ডাকি-লেন, কোচম্যান্—”

* * * * *

আর ইন্দু? সমবয়স্কাদের সহিত ইন্দুর সে খেলা আর ভাল লাগে না, কথা কহিবার আগে ইন্দুর মুখে যে হাসি আপনি ফুটিয়া উঠিত, সে হাসি আর আসে না, ইন্দু সে উচ্চহাসি আর হাসে না, দুই দিনে সে যেন কত বিজ্ঞ হইয়া

পড়িয়াছে, সে সদা-প্রফুল্ল মুখে যেন বিষাদের ছায়া পড়িয়াছে, সে শরতের জ্যোৎস্না যেন মেঘে ঢাকিয়াছে, সে কাঁচা বাঁশে যেন ঘুণ ধরিয়াছে। সত্যই যেন এতদিন ইন্দুর "হৃৎ-পদ্ম ছিল অপ্রকাশ!" কিন্তু যে ভৃঙ্গের মধুর ঝঙ্কারে সে হৃদয়-কোরক বিকশিত হইল, কোথায় সে আজ? হায়, পথিক! কেন তুমি দুদিনের জন্য আসিয়াছিলে?

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।
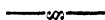
সেই ত সব, সেই জনক-জননী, সেই ভাই-ভগিনী, সেই সমবয়স্কা সঙ্গিনী, সবই ত সেই—তবে ইন্দুর এ সবে আর সে তন্ময়তা নাই কেন?

"ইন্দুর কি হৈল অন্তরেতে ব্যথা?"

ইন্দুর হৃদয়ে এ আকাঙ্ক্ষা, এ অভাব, এ অপূর্ণতা, সহসা কে জাগাইয়া দিল?

ইন্দু শুধু পথ চাহিয়া থাকে—কবে স্বামীর হস্তাক্ষর পাইবে, শুধু দিন গণিতে থাকে—কবে পূজার ছুটি আসিবে, শুধু ভাবে—কবে আবার দু'জনে মিলিবে!

আশাপথ চাহিতে চাহিতে, দীর্ঘ দিন গণিতে গণিতে, ঠাকুরাণীদিদিদের বিদ্রূপ সহিতে সহিতে, আর হৃদয়ের বেদনা বহিতে বহিতে, ইন্দুর দিন কাটিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে পূজার ছুটির দিন নিকটে আসিল,—ইন্দুর মলিন মুখে হাসি ফুটিল।

শরৎকাল। দিগন্তবিস্তৃত, বায়ু-হিল্লোল-বিধূত

শ্যামলশস্যরাজি দেখিতে দেখিতে মন মুগ্ধ হইয়া যায়। এ যেন বিক্ষুব্ধসাগরবক্ষে শ্যামতরঙ্গরাজির অপূর্ব্ব লীলা! গ্রামে গ্রামে অশ্বত্থ, বট, আম্র, বকুল প্রভৃতি বৃক্ষসকল কেমন সতেজ, তাহাদের শাখায় শাখায়, পাতায় পাতায়, চিক্কণ যৌবন উদ্ভাসিত। মাঝে মাঝে স্তবকে স্তবকে ‘রাধা-চূড়া-পুষ্পের লোহিত আভা শ্যামলপত্রের অব-কাশ-পথে পড়িয়া মন হরণ করিতেছে। বিল-খাল-পুষ্করিণী সবই কাণায় কাণায় পুরিয়া উঠি-য়াছে! এই সরিৎ-শীতলা, শস্য শ্যামলা পত্র-পুষ্প-ভূষিতা শরৎ রাণীর পরিপূর্ণ শোভা দেখিতে দেখিতে হৃদয়ে যেন কি এক নূতন শক্তির সঞ্চার হয়! আশায়-আকাঙ্ক্ষায় হৃদয় মাতিয়া উঠে। আর সেই ‘শক্তিসাধনার’ সঙ্গে সঙ্গে প্রবাসী আত্মীয়ের জন্য বাঙালীর মন আকুল হইয়া পড়ে। বিশেষত জননীর প্রাণ তখন পরগৃহ-বাসিনী, প্রাণ-প্রতিমা নন্দিনীর জন্য নিতান্তই অধীর হয়। তখন শত জননীর ব্যাকুলতাপূর্ণ করুণ-আগমনী গীতি বাংলার গৃহে গৃহে ধ্বনিত হইতে থাকে। এমন

দিনে কি কোন জননী প্রাণ ধরিয়া 'ঘরের মেয়েকে পরের বাড়ী' পাঠাইতে পারেন? তাই আজ ইন্দুর জননীর এত দুঃখ! "বেয়ান-মাগীর কি আক্কেল গা, পূজা সাম্‌নে ক'রে কিনা নিতে পাঠিয়েছে! তার কি পেটের মেয়ে নাই! মায়ের ব্যথা কি সে জানে না?" কিন্তু হায়! মেয়ের মায়ের যে সবই অরণ্যে রোদন! যে ইন্দু এতদিন স্বামিদর্শন লালসায় আশাপথ চাহিয়াছিল, আশুমিলনের ভরসায় উৎফুল্ল হইতেছিল, আজ সহসা তাহার এ কি পরিবর্ত্তন! ক্ষুধিত-হৃদয়া ইন্দু আজ চির-বাঞ্ছিতের নিকট যাইতেছে, এ সুখের দিনে তাহার এ দুঃখ কেন? ইন্দু মার গলা ধরিয়া, ছোট ভাইটিকে কোলে করিয়া, সঙ্গিনীর পাশে দাঁড়াইয়া, অকপটে চক্ষের জল ফেলিতেছে, চক্ষের জলে বুক ভাসিতেছে, কাঁদিয়া কাঁদিয়া তার চক্ষু ফুলিয়াছে! কে জানে, এ রহস্য কেমন, কে বুঝে রমণীর মন!

যাত্রার সময় বহিয়া যায় দেখিয়া, মেয়ের চক্ষের জল মুছাইতে মুছাইতে, মা ইন্দুকে পাল্কীতে তুলিয়া

দিলেন। অলক্ষণ জানিয়াও যাত্রাকালে মা চক্ষের জল সংবরণ করিতে পারিলেন না! কিন্তু

"মা, তুমি বোকা মেয়ে কেন কেঁদে মর।
ভেবে দেখ মা, তুমি কার ঘর কর!"

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

শারদীয়া পূজার মোট আর দুই দিন বাকী। আজ আফিস করিয়া প্রভাতের ছুটি। অন্যবার ছুটি হয় বারদিন, এবার বড়-সাহেব দয়া করিয়া, জোড়াতাড়া দিয়া, ছুটিটা দিন-দুই বাড়াইয়া দিয়াছেন;—আনন্দের কথায় আর কাজ কি? বড়-সাহেবের জয় জয়কার হোক্।

প্রভাত আফিস হইতে বাসায় আসিয়া তাড়াতাড়ি হাত মুখ ধুইয়া, যৎকিঞ্চিৎ জলযোগ করিয়া লইলেন;—বলিতে লজ্জা করে, বাড়ী যাইবার আমোদে, এ বয়সেও প্রভাতের উদর পূরিয়া উঠিল। চিরপ্রবাসী কেরাণী সারাটি বৎসর পরে বাড়ী যাইতেছে, তার আহ্লাদ তোমরা সবাই বুঝিবে কি? ক্ষিপ্রহস্তে জিনিষপত্র গুছাইয়া লইয়া "নদী যথা ধায় সিন্ধু পানে"—প্রভাত গৃহোদ্দেশে ছুটিলেন।

হাওড়া ষ্টেশনে ঢুকিতে না ঢুকিতে একটা অস্ফুট জনকল্লোল শুনা গেল। বোধ হইল যেন সমুদ্র গর্জ্জিতেছে! ষ্টেশনে, টিকিট-ঘরে, লোকে লোকারণ্য; টিকিট লইয়া প্রভাত তখনই গাড়িতে উঠিলেন। গাড়ি কিন্তু সব ভরপূর। বহুকষ্টে বসিবার স্থান মিলিল। যে স্বর্গে উঠিতেছে, সে সিঁড়ির ভয় করে না,—কাজেই প্রভাতও এ কষ্ট গায়ে মাখিলেন না। একটু পরে, গাড়ি ছাড়িবার ঘণ্টা পড়িল; ত্রস্তা, ভীতা ফণিনীর মত তীরবেগে গাড়ি ছুটিল।

প্রভাতের গাড়িতে অধিকাংশই গৃহযাত্রী বাঙালী। কেহ বালক, কেহ বৃদ্ধ, কেহ যুবক। কাহারও জন্য স্নেহময়ী জননী পথ চাহিয়া চাহিয়া আছেন,—কবে তাঁহার অঞ্চলের নিধি, কাঙালের সোণা বিদেশ হইতে ফিরিবে! কাহারও পুত্র-কন্যা, আত্মীয় বন্ধুবান্ধব আশাপথ ধরিয়া আছেন; কাহারও বা প্রণয়িনী কাঁদিয়া কাঁদিয়া দিন গণিতে-ছেন, কবে আবার তাঁহার সেই প্রবাসক্লিষ্ট হৃদয়-সর্ব্বস্ব স্বামী গৃহে ফিরিবেন। হায়! আবার

কতদিনে, সেই বিরহ-বিধুরা পথিকবধূ, বঁধুর বুকে মাথা রাখিয়া, সারা বছরের দুঃখ-যন্ত্রণা ভুলিবেন।

আনন্দময়ী মার আগমনে, বঙ্গে যে এত আনন্দ উচ্ছ্বাস, বুঝি বা প্রিয়জনের মিলন-আশাই ইহার প্রধান কারণ! ক্রমে গাড়ি ষ্টেশনের পর ষ্টেশনে থামিতে থামিতে প্রভাতের গন্তব্য ষ্টেশনে উপস্থিত হইল, প্রভাত নামিয়া পড়িলেন। রাত্রি তখন আটটা। ষ্টেশনের বাহিরে, প্রভাতদের গ্রামস্থ তিনটি স্কুলের ছাত্রের সঙ্গে দেখা হইল; একজন কিশোরবয়স্ক, আর দু'টি বালক। তাঁহারা তিনজনেই একপরিবারভুক্ত, কলিকাতায় থাকিয়া পড়াশুনা করেন। সম্প্রতি ছুটিতে বাড়ী যাইতেছেন। ইঁহারা চারিজনে একখানি ঘোড়ার গাড়ি ভাড়া করিবেন, স্থির হইল। বহু গ্রাহক, এ দিকে গাড়ি কম, গাড়োয়ানদের সুতরাং পোয়াবারো! অন্যসময় তাহারা ছুটিয়া আসিয়া হাতের ব্যাগ্ বহিয়া গাড়িতে লইয়া যায়, আজ আর তাহাদের মাটিতে পা পড়ে না। তারা কোচ্‌বাক্সে

গম্ভীরভাবে সমান বসিয়া রহিল। কিন্তু গরজ বড় বালাই; প্রভাত নিজের দায়ে অগত্যা মহম্মদের সেই উপদেশ-বাক্য স্মরণ করিলেন। গাড়োয়ানেরা কেহ অগ্রসর হয় না দেখিয়া, প্রভাতই শেষ, গাড়ির কাছে হাজির হইলেন। অন্য সময় দুইটাকার মধ্যেই গাড়ি মিলে, কিন্তু আজ আর কেহ পাঁচ-টাকার কমে যাইতে স্বীকৃত হইল না। তাই স্বীকার করিয়া প্রভাতেরা গাড়িতে উঠিলেন; গাড়ি চলিতে আরম্ভ করিল; পক্ষিরাজদ্বয়, গজেন্দ্র-গতিতে ছুটিলেন। তাহাদের প্রতি পদক্ষেপে, একটা গভীর ঔদাস্য ও নির্লিপ্ত-তার ভাব প্রকাশ পাইতেছিল। হায়! এই অশ্বিনীকুমার-যুগলেরও বুঝি গাড়োয়ানদের মত পায়াভারি হইয়াছে।

যাই হোক্, কোনরূপে প্রভাত রাত্রি এগারটার সময় যথাস্থানে পৌঁছিলেন। এইবার নৌকায় যাইতে হইবে, এখান হইতে প্রভাতদের বাড়ী সাতক্রোশ, তবে জলপথে কিছু ঘুরিয়া যাইতে হয়।

সেদিন চতুর্থী; সুতরাং জ্যোৎস্না অনেকক্ষণ

ডুবিয়া গিয়াছে, রাত্রি কিছু অন্ধকার, তবে ঘোর নহে; সেই তরল অন্ধকার ভেদ করিয়া তারকা-রাজি অল্প অল্প কিরণ দিতেছিল। প্রভাত তখনই নৌকা ছাড়িয়া দিলেন। অনুকূল বাতাস বহিতে-ছিল, মাঝিরা পাল তুলিয়া দিল, সেই নিশীথে অনন্ত-আকাশ-তলে, প্রশান্ত ভাগীরথী-বক্ষে, পাল-ভরা নৌকা তরতর বেগে মুক্তপক্ষ কলহংসীর মত চলিল। আশ্বিনে, বর্ষার সে দুর্দ্দমনীয় চাঞ্চল্য নাই, কিন্তু ভাগীরথী এখনও কাণায় কাণায় পূর্ণ। যৌবনের মত্ততা গিয়াছে, কিন্তু যৌবন আজিও ঢল-ঢল। গঙ্গার উভয়কূলের দূরস্থ গ্রামগুলি কুয়াসা-চ্ছন্ন বলিয়া বোধ হইতেছিল। গাছপালা সবই ছায়া-ছায়া, যেন চিত্রার্পিত! দেখিতে বড় সুন্দর! কোথাও বা অদূরে দুই-একটা সৌধশ্রেণী পড়িয়া আছে, কোনটির বা মুক্তবাতায়নপথে আলো দেখা যাইতেছে। দূরে মাঝিমাল্লারা সারি গাহিয়া চলিয়াছে, গান বুঝা যায় না, কিন্তু সেই গভীর নিস্তব্ধ রজনীতে সঙ্গীতের সেই শেষভাগ বড়ই মধুর শুনাইতেছিল!—আর প্রভাতের মনে যে

সঙ্গীত বাজিতেছিল, তাহা আরও মধুর! ক্রমে প্রভাতের তন্দ্রা আসিল, তন্দ্রা স্বপ্নময়, আর স্বপ্ন যে কি-ময়, তাহা বলিতে হইবে কি?

কখন্ প্রভাত হইয়াছিল, প্রভাত জানিতে পারেন নাই। বেলা তিন চারি দণ্ডের সময় মাঝিদের ডাকে প্রভাতের ঘুম ভাঙিয়া গেল। মাঝিরা বলিতেছে, "বাবু! ঘাটে এসেছি, উঠুন—কথাটা

কাণের ভিতর দিয়া, মরমে পশিল গো,—
আকুল করিল তার প্রাণ।

প্রভাত আর কি স্থির থাকিতে পারেন? তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিলেন। সঙ্গে যে বালক-দুইটি ছিল, তাহারা নৌকা ঘাটে লাগিবামাত্রই লাফ দিয়া ঘাটে উঠিয়াছিল—তীরে উঠিতে না উঠিতে তাহারা কতদূর চলিয়া গেল।

গঙ্গার ধার হইতে প্রভাতদের বাড়ী এক-পোয়া পথ। গ্রামের নীচেই বিল, কিন্তু ঘুরিয়া সেই বিলপথে গেলে প্রায় দুই ঘণ্টা লাগে। প্রভাত ততটা ঘুরিতে প্রস্তুত ছিলেন না।

বালক-দুইটী চলিয়া গেলে, প্রভাত সেই

কিশোরটিকে বলিলেন—"কই উপেন, তুমি যে ওদের সঙ্গে গেলে না?" সে কোন উত্তর দিল না, কেবল প্রভাতের দিকে চাহিল, চাহিয়া একটু হাসিল। সে হাসি ঔদাস্যের! তাহার মত বয়সে সকলেরই একদিন এইরূপ উদাসভাব আসে। বাল্যকালে পূজা বলিয়া, গৃহ বলিয়া, যে একটা দুর্দ্দমনীয় টান থাকে, আমোদে যত উৎসাহ থাকে, বয়সে ক্রমে তাহার হ্রাস হইয়া আসে। শেষে কিশোরবয়সে একেবারেই কমিয়া যায়। তখন একটা উদাসভাব, হৃদয় ছাইয়া ফেলে। বাল্য-কালের সে সব আমোদে মন আর মাতে না, সে সব বাঁধনে আর তেমন টান থাকে না, যেন কি-একটা অভাবে, কি-একটা শূন্যতায় হৃদয় সদাই খাঁখাঁ করিয়া বেড়ায়। পুরাতনের কিছুতেই আর তাহা পূর্ণ হয় না। শেষ আর-এক নূতন বন্ধন হয়, সে বন্ধনে শিথিল গ্রন্থি সব আবার দৃঢ় হইয়া পড়ে, জগৎ আবার স্নেহময় হইয়া উঠে; শীতের পর বসন্তের উদয় হয়।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

প্রভাত বাটীপ্রবেশ করিতে না করিতে "কাকাবাবু দাও সন্দেশ, আমরা সবাই খাই" বলিয়া প্রভাতের ভ্রাতুষ্পুত্র ও ভাইঝি দুটি ছুটিয়া কাছে আসিল। প্রভাত অতটা খেয়াল করিয়া সন্দেশ আনেন নাই, মনে মনে কিছু অপ্রতিভ হইলেন। কিন্তু প্রভাত সন্দেশ দিতে না পারিলেও বালক-বালিকা-দলের উৎসাহভঙ্গ হইল না। তাঁহারা কেহ ঝাঁপাইয়া প্রভাতের কোলে উঠিল, কেহ বা হাত ধরিয়া 'কাকা এসেছে গো' 'কাকা এসেছে গো' রবে বাড়ী তোলপাড় করিতে করিতে প্রভাতকে অন্দরের দিকে টানিয়া লইয়া গেল; তখন একে একে প্রভাতের মা, ভগিনী, পিসি-মাতা, ঠাকুরমাতা প্রভৃতি সকলে তাঁহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইলেন; গুরুজনদিগকে যথারীতি প্রণাম

করিলে পর ভগিনী প্রভাতকে বসিবার জন্য এক-খানি মাদুর বিছাইয়া দিলেন। বালক-বালিকার দলও তখন কেহ প্রভাতের কোলে, কেহ পাশে বসিল। মা খাবার আনিতে গেলেন, আর সকলে কাছে বসিয়া গল্প করিতে লাগিলেন; অনেকদিনের পর স্নেহের পুত্তলি ও ভক্তির প্রতিমাগুলি দেখিয়া প্রভাতের হৃদয় আনন্দে উছলিয়া উঠিল; আমরা সত্য কথা লুকাইব না, কথা কহিতে কহিতে প্রভাত মাঝে মাঝে অন্যমনস্ক হইতেছিলেন। তাঁহার চঞ্চল চক্ষু কোন একটি নেপথ্যবর্ত্তিনীর উদ্দেশে ছুটিয়া বেড়াইতেছিল। আরও একটি উৎসুক দৃষ্টি যে, অদূরে অন্তরালের ছিদ্রপথে ঘনপক্ষ্মচ্ছায়াতলে চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল, তাহা প্রভাতের অন্তর জানিত।

জল খাওয়ার পর প্রভাত বন্ধুবান্ধবদের সহিত দেখা করিতে বাহির হইলেন। পূজায় অনেকেই বাটী আসিয়াছেন, একে একে প্রায় উপস্থিত সকলের সঙ্গেই দেখা করিলেন।

বাল্যকালের সেই বাঁধাঘাট, সেই বটগাছ, সেই

বকুলতলা সকলই দেখিলেন। শৈশবের কত কথা মনে পড়িল, হায়, আজ সে সব দিন কোথায়? আর সেই শৈশবের সেই যে সঙ্গী তারাই বা আজ কোথায়? কেহ দেশান্তরে, বহুকাল দেখা নাই, কেহ লোকান্তরে, এ জীবনে দেখিবার আশা নাই!

দেখাসাক্ষাতে, আহারে, নিদ্রায়, গল্পে, গানে সমস্ত দিন কাটিয়া গেল; রাত্রি নয়টার পর প্রভাত আহারাদি করিয়া শয়ন-গৃহে গেলেন। আজ এ পর্য্যন্ত প্রভাত তাঁর সেই নয়নানন্দদায়িনীর সাক্ষাৎ পান নাই। বালিকা বা যুবতী বধূর প্রথম শ্বশুরবাটী আসিয়া দিবসে স্বামি-সন্দর্শন বড় কঠিন কথা! গৃহে আসিয়া প্রভাত প্রায় আধ-ঘণ্টা শুইয়া রহিলেন। পাতাটি নড়িলে, বায়ু একটু সশব্দে বহিলে উৎফুল্ল হইয়া উঠেন, কিন্তু বৃথা আশা! তখন তাঁর মনে হইতে লাগিল—

“জানে কাঁদি তার তরে,
তবু সে বিলম্ব করে—
রমণী নিদয়!”

কাজকর্ম্ম সমাধা করিয়া ইন্দুর আসিতে এ বিলম্বটুকু হইতেছে বুঝিয়াও প্রভাতের অবুঝ মন চঞ্চল হইয়া উঠিল, ক্রমে যেন শয্যা-কণ্টক উপস্থিত হইল, প্রভাত পাশ ফিরিয়া শুইলেন; ধীরে ধীরে সহসা কে আসিয়া প্রভাতের চক্ষু টিপিয়া ধরিল!—কি কোমল স্পর্শ!

নবম পরিচ্ছেদ।

প্রভাতদের বাটীতে পূজা হয়। আজ সপ্তমী-পূজা। পূজার বাদ্য বাজিয়া উঠিয়াছে। দলে দলে বালক-বালিকাগণ "আঙা কাপল" পরিয়া পূজা দেখিতে ছুটিয়াছে।

সন্ধ্যার পর আরতি। পুরোহিতঠাকুর যথা-সময়ে পঞ্চপ্রদীপহস্তে আরতি আরম্ভ করিলেন। তাঁহার হস্তের সেই কলাকৌশলময় সঞ্চালন দেখিবার জিনিষ। প্রতিমার নিকটে ঘনঘন ধূপধুনা জ্বালান হইতেছিল—উভয় পার্শ্বে সারি বাঁধিয়া চামর-ব্যজন চলিতেছিল, মাঝে মাঝে লাল-নীল আলোয় চণ্ডীমণ্ডপ উজ্জ্বল হইয়া উঠিতেছিল। কাঁশর ঘণ্টার রবে দিক পূরিয়া উঠিয়াছিল; সঙ্গে সঙ্গে ঢাক-ঢোল-শানাই বাজিতেছিল। অসংখ্য নরনারী ভক্তিভরে, একদৃষ্টে প্রতিমা নিরীক্ষণ করিতেছে, এ সময়ে এ দৃশ্য দেখিতে দেখিতে মনে

কেমন-একটা পবিত্রভাব আসে, ভক্তিভরে হৃদয় পুলকিত হইয়া উঠে।

পরদিন অষ্টমীপূজা। অন্যবার সন্ধিপূজা গভীর নিশীথে হইয়া থাকে, এবার আরতির সঙ্গে সঙ্গেই সন্ধিপূজা আরম্ভ হইল। আজ পূজার জমজমাটা আরও কিছু বেশী রকমের।

নবমীর দিন লোকজন খাওয়াইতেই কাটিয়া গেল। তার পর বিজয়া দশমী; বৈকালে প্রতিমা-বরণ হইল। আজ গ্রাম ও আশপাশ হইতে অনেক লোক বিসর্জ্জন দেখিতে আসিয়াছে।

সে গ্রামে আরও দুইখানি পূজা হইত। তিন-খানি প্রতিমা একত্রে গ্রাম প্রদক্ষিণ করিয়া এক-সঙ্গে বিসর্জ্জন দেওয়ার প্রথা। গ্রামের প্রান্তেই বিল। সেই বিলে প্রতিমাবিসর্জ্জন হয়। বিল এখনও জলে পূর্ণ, সুতরাং প্রতিমা লইয়া "বাচ্-খেলার" বড় সুবিধা। প্রভাতেরাও নৌকাবিহারের লোভ সংবরণ করিতে পারিলেন না। প্রকাণ্ড বিল, বিলের এক ধার হইতে অন্য ধার স্পষ্ট নজর চলে না। চারিদিকে কেবল স্থির জলরাশি, মাঝে

মাঝে নিমজ্জনোন্মুখ গুল্মবৃক্ষাদির শাখা জাগিয়াছে মাত্র। সেই সব শাখায় শাখায় শ্যামলপত্রের অন্তরালে বক-সারসাদি বসিয়া আছে। কোথাও বা কলহংস, কারণ্ডব, চক্রবাক-মিথুন প্রভৃতি জলচর পক্ষী সন্তরণ করিতেছিল—সন্ধ্যা সমাগত দেখিয়া তাহারা ঝাঁকে ঝাঁকে কুলায়-উদ্দেশে চলিয়া গেল।

সন্ধ্যার পর বিসর্জ্জন দিয়া প্রভাতেরা নৌকা ফিরাইলেন। কূলে পৌঁছিবার পূর্ব্বেই জ্যোৎস্না উঠিয়াছিল। কৌমুদী-কিরণ-সম্পাতে জলরাশির শোভা দেখিতে দেখিতে সকলে উপরে উঠিলেন। তখন শানায়ে পূরবী রাগিণীতে বিসর্জ্জনের গান গাহিতেছিল—সেই গানের সঙ্গে তখনকার প্রাণের সুর মিলিল।

গৃহে ফিরিতে একটু রাত্রি হইল। তার পর সকল পরিবার একত্র হইয়া সম্বন্ধ অনুসারে প্রণাম, আলিঙ্গন, অশীর্ব্বাদ চলিতে লাগিল। শেষ, গ্রামস্থ স্বজাতি, কুটুম্ব, আত্মীয়, সকলের বাটী [illegible] বিজয়ার প্রণাম-উদ্দেশে সকলে বাহির হইলেন।

আজ আর শত্রুমিত্রভেদ নাই, শত্রু শত্রুতা ভুলিয়া মহাশত্রুকে আলিঙ্গন করিতেছে, আজ সকলের মন যেন শান্তি ও ক্ষমায় পূর্ণ।

আহারাদির পর প্রভাত শয়নগৃহে বসিয়া আছেন, সহসা তাঁর গৃহিণী আসিয়া ঢিপ করিয়া একটি প্রণাম করিলেন। নূতন নিয়মে, গৃহিণী-কুলের নিকট আর বড়-একটা প্রণাম পাওয়া যায় না, তাই বোধ হয় প্রভাত প্রথমে একটু বিস্মিত হইয়াছিলেন। বিস্ময়ের প্রথম মুহূর্ত্ত অতীত হইলে, প্রতিদানে প্রভাতও তাঁর কর্ত্তব্যসাধন করিলেন।

আজ পূর্ণিমা। রাত্রে ওপাড়ায় রায়েদের বাটীতে যাত্রা হইবে। প্রভাত এখন একটা রাত্রিও নষ্ট করিতে প্রস্তুত নহেন। কিন্তু কি করেন, বন্ধুবান্ধবদের অনুরোধ ও বিদ্রূপে পড়িয়া যাত্রা শুনিতে যাইতে হইল। রাত্রি বারটা পর্য্যন্ত থাকিয়া শেষ পাশ কাটাইয়া চলিয়া আসিলেন। শয়নগৃহের দ্বারে আসিয়া শিকল নাড়িলেন, দরজা খুলিয়া ঠাকুরমাতা বাহির হইলেন, একটু রহস্য করিতেও ছাড়িলেন না। প্রভাত ঘরে

গিয়া দেখিলেন, তাঁর গৃহিণী নিদ্রাভিভূতা। কয়েক-দিন উপর্য্যুপরি রাত্রি জাগিয়া আজ এই অবকাশে একটু ঘুমাইয়া লইতেছেন। এতক্ষণ ঠাকুরমা তাঁর কাছে ছিলেন, শিকলনাড়ার শব্দ শুনিয়াই তাঁর ঘুম ভাঙিয়াছিল, তিনি আর ইন্দুর ঘুম না ভাঙাইয়া দুয়ার খুলিয়া দিলেন।

মুক্তবাতায়নপথে পূর্ণচন্দ্রের কিরণ আসিয়া শয্যায় পড়িয়াছিল! প্রভাত দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া সেই শরৎজ্যোৎস্নার সহিত তাঁহার গৃহজ্যোৎস্নার মিলন দেখিতেছিলেন।

* * * * *

ক্রমে ছুটির দিন ফুরাইল। আজ রাত্রি দশটার পর প্রভাতকে কলিকাতায় রওনা হইতে হইবে।

প্রভাত সমস্তদিন কোথাও বড়একটা বাহির হইলেন না—মা, পিসিমা, ভগিনী, ইহাদের কাছে-কাছেই রহিলেন। আর সন্ধ্যার পরই আহার করিয়া শয়ন করিতে গেলেন।

প্রভাত যাওয়ার একটু পরেই গৃহিণী উপস্থিত

হইলেন। সেই স্বভাবপ্রফুল্ল মুখখানি আজ বড় বিষণ্ণ।

অন্য দিনের অপেক্ষা দশটা আজ যেন দু'চারি ঘণ্টা পূর্ব্বে বাজিল। বিদায়কালীন মিলন যখন নিবিড়তম, তখন কে ডাকিল,—

"বাবু, মাঝি এসেছে।"

প্রভাত একে একে সকলের কাছে বিদায় হইয়া নৌকায় উঠিলেন। নৌকা ছাড়িয়া দিল।

দশম পরিচ্ছেদ।

কথায় বলে, "বয়স যায় না জল যায়", সেটা কিন্তু নিতান্ত মিথ্যা নহে। যখন ইন্দুর বিবাহ হইল, তখন ত তার সহোদরা চারুর বয়স সবেমাত্র আট। ইন্দুর পিতা, ইন্দুকে পাত্রস্থ করিয়া ভাবিয়াছিলেন, 'আঃ, কয় বৎসরের মত ত ভাবনা-চিন্তা হইতে বাঁচা গেল!' কিন্তু তিনটা বৎসর যে দেখিতে দেখিতে অতীত হইল! সেই সে দিনকার মেয়ে চারু ইহারই মধ্যে বিবাহের যোগ্যা হইয়া উঠিয়াছে, কিন্তু সুপাত্রের সন্ধান পাওয়া যাইতেছে না, পিতা ধীরে-সুস্থে চেষ্টা করিতেছেন, আর মা, তাঁর উদ্বেগের কথায় আর কাজ কি—চক্ষে নিদ্রা নাই, আহারে রুচি নাই, গৃহকর্ম্মে তন্ময়তা নাই, মুখেরও কামাই নাই! কেমন করিয়া জাতি কুল রক্ষা হইবে, ধর্ম্ম থাকিবে, তিনি এই ভাবনাতেই অধীর! বার বছরের মেয়ে যার গলায়, সে কেমন করিয়া স্থির থাকে, গৃহিণী ত তাহা বুঝিতেই

পারেন না, কাজেই বাক্যবাণে কর্ত্তা সর্ব্বদাই জর্জ্জরিত! কর্ত্তা ত আজকাল অন্দরমহলে দিবাভাগে বিশেষ প্রয়োজন ভিন্ন প্রায়ই প্রবেশ করেন না, আহারান্তে নথনাড়ার ভয়ে অধিকক্ষণ অন্দরে তিষ্ঠেন না। রাত্রিতে গৃহিণীর শয়নগৃহে প্রবেশের পূর্ব্বেই নিদ্রায় অভিভূত হন! সহজে নিদ্রা না আসিলে কপটনিদ্রার আশ্রয় লন! কিন্তু এত করিয়াও গৃহিণীর হাত হইতে রক্ষা পাইবার উপায় নাই। মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা চলে না, কিন্তু কন্যাদায়গ্রস্তা জননী সে বিধি-নিষেধের ধার ধারেন না। ঘুমাইয়াও কর্ত্তার নিস্তার নাই। গৃহিণী তাঁহার বচনভাণ্ডের অক্ষয় তূণ হইতে বাছিয়া বোছিয়া এমন এমন বিষাক্ত বাণ প্রয়োগ করেন যে, কপটনিদ্রাভিভূত কর্ত্তাটিকে মাঝে মাঝে অন্তত পাশমোড়াও দিতে হয়! গৃহিণীর অন্যায় ও অর্থশূন্য কথার প্রতিবাদ করিবার লোভটাও সময়-সময় কর্ত্তার অসংবরণীয় হইয়া উঠে, কিন্তু পাছে তাঁর এই কপট বিদ্যাটা ধরা পড়ে, তাই কিল খাইয়া কিল চুরি করেন, আর মনে মনে ভাবেন—

"কাশী মিত্র বা নিমতলার ঘাট কোনটাই শর্ম্মার অবিদিত নাই, তবে মরে যে আছি, এই দুঃখ!" কিন্তু সব সময়েই যে কর্ত্তার কৌশল খাটে, তা নয়; এক সময় না এক সময় তাঁকে গৃহিণীর হাতে পড়িতেই হয়। তখন গৃহিণীর বচনে জোয়ার বহে, মুখে খৈ ফোটে, চোখে আগুন ছোটে! তখন কোথায় লাগে সুরেন্ বাঁড়ুয্যের "এলোকোয়েন্স", আর কোথায় বা লাগে কালীবাবুর "রিজনিং"! তা সুরেনবাবুর বক্তৃতাতেও দেশ জাগিল না— আর গৃহিণীর বচনেও কর্ত্তাকে টলাইতে পারিল না। কর্ত্তার কঠিন চর্ম্ম গৃহিণী কিছুতেই ভেদ করিতে পারিলেন না, কারণ কর্ত্তা একটু একেলে লোক, "মেয়ের বার-বছর বয়স হলো ত কি হলো?—ঐ তোমাদের পুরাকালের 'সাবিত্রীর' বিবাহ কত বয়সে হইয়াছিল?" কিন্তু কর্ত্তার এ সকল যুক্তি কে শুনে। গৃহিণী যখন কিছুতেই আর কর্ত্তাকে আঁটিয়া উঠিতে পারিলেন না, তখন রমণীর যে অমোঘ ব্রহ্মাস্ত্র—অশ্রুকণা, তাহাই প্রয়োগ করিলেন!—গিন্নি কাঁদিয়া কেবল যে মাটী

ভিজাইলেন, তাহা নহে; কর্ত্তার মনও ভিজাইয়া দিলেন। অবলার বল—চক্ষের জল,—গৃহিণী বুঝি এতদিন তাহা ভুলিয়াছিলেন। তা গৃহিণীরই বা দোষ দিব কি? আমাদের দেশের বড় বড় রাজনৈতিকেরাও এ কথা ভুলিয়া আছেন। যে দুর্ব্বল, তাহার বচন-বীরত্বে কি লাভ? মুণ্ডমালার দাঁত-খামুটিতে কি কর্ত্তাদের মন টলে? আমাদের সম্বল যে চক্ষের জল! "বালানাং রোদনং বলম্।" তা সে কথা যাক্, কথা হইতেছিল, চারুর বিবাহ-সম্বন্ধে; কর্ত্তা এক্ষণে বিশেষ করিয়া আত্মীয়-বন্ধুকে সুপাত্রের সন্ধান জন্য লিখিলেন, গৃহিণীর কিন্তু ইচ্ছা, কর্ত্তা স্বয়ং কিছুদিন পাত্রের অনুসন্ধানে ফিরেন। তা কর্ত্তা সে দিক্ দিয়া যান না, তাঁর কথা, বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য পাদমেকং ন গচ্ছামি! কিন্তু এতদ্দিনে বুঝি চারুর বিবাহের ফুল ফুটিল! প্রভাত একটি সুপাত্র স্থির করিয়াছেন। পাত্রটি এককালে প্রভাতেরই সতীর্থ ছিলেন, চারি-বৎসর পূর্ব্বে, ইন্দুর সহিত এই পাত্রের সম্বন্ধের কথাবার্ত্তা হয়, কিন্তু তখন, এ পাত্রের বিবাহে মত ছিল

না,—তিনি লেখাপড়া শেষ না করিয়া, বিশেষত এগার বার বৎসরের মেয়ে বিবাহ করিতে সম্মত ছিলেন না। 'ল' পাস্ করিয়া প্র্যাক্‌টিস্ করিতে করিতে এক্ষণে কিন্তু তাঁহার মতের পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। কিঞ্চিৎ নগদ অর্থ পাইলে এখন তিনি পাত্রীর পিতাকে গৌরীদানের ফলভোগী করিতেও কুণ্ঠিত নহেন!

পাঁচটা পাস্ করা উকিল জামাই পাওয়া গিয়াছে, জানিয়া গৃহিণী আহ্লাদে আটখানা হইলেন—প্রভাতকে রাজরাজেশ্বর হইবার বর দিয়া স্বহস্তে পত্র দিলেন—"বাপাজী, সেই পাত্রই স্থির ক'রো, টাকার জন্য আটকাইবে না—কিন্তু এই আষাঢ়মাসেই বিবাহ দিতে হইবে।"

নগদ টাকার পরিমাণ শুনিয়া কর্ত্তা কিছু ইতস্ততে পড়িয়াছিলেন, সভয়ে গৃহিণীকে আপত্তির একটু আভাসও দিয়াছিলেন—কিন্তু তাহাতেই গৃহিণী দলিত ফণিনীর মত গর্জ্জিয়া উঠিলেন। দারুণ ক্রোধের সহিত বলিলেন, "সেইখানেই মেয়ে

দেব, দেব, দেব, ওখানে যদি বিয়ে না হয়, তা' কোন্ বেটী না গলায় দড়ি দেয়।"

সর্ব্বনাশ! ইহার উপর আর কথা চলে না!

* * * * *

সব ঠিকঠাক। আষাঢ়মাসেই বিবাহ।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

আষাঢ় মাস। সন্ধ্যা অতীত। যেমন মেঘ, তেমনি বৃষ্টি, বাতাসেরও বড় জোর। ইন্দু ভগিনী চারুকে "কনে" সাজাইতে সাজাইতে মাঝে মাঝে যেন অন্যমনস্ক হইতেছে। ইন্দুর এ ভাবান্তর আর কেহ বুঝিতে না পারিলেও চারু বুঝিয়াছিল; সে তার দিদির মনের ভাব লুকিয়া লইয়া বলিল, "দিদি! কই প্রভাতবাবু ত এলেন না?" সে সময় সেখানে আর কেহ ছিল না,—ইন্দু নিশ্বাসটা একটু জোরে ফেলিয়া বলিল, "তাই ত ভাই, আমিও ভাবচি, পথে না জানি কত কষ্টই পাচ্চেন।" ইন্দু তবু মনের সকল আশঙ্কা খুলিয়া বলিল না। আজ ভগিনীর বিবাহের এ উৎসব, এ আমোদ যেন তার নিকট কেমন ফাঁকফাঁক মনে হইতেছে, সে যেন প্রাণ ঢালিয়া ইহাতে যো[illegible] দিতে পারিতেছে না! ইন্দুর মাও দুই একবার প্রভাতের কথা তুলিলেন। চারুর বিয়ে, জামাই

এলেন না, এ অভিমানও করিলেন, ইন্দু কিন্তু জানিত, বিশেষ কোন বিঘ্ন না ঘটিলে স্বামী আসিবেনই, সেইজন্যই তার অধিক চিন্তা।

ক্রমে বিবাহের লগ্ন উপস্থিত হইল, 'কনেকে' বিবাহসভায় লইয়া যাইতে হইবে। তিন চারিজন আত্মীয় যুবক পীড়ি ধরিতে আসিলেন,—তাহার মধ্যে অতিমাত্র স্নেহের স্বরে, স্মিতমুখে কে বলিল, 'কি চারু!' চারু প্রশ্নকর্ত্তার দিকে চাহিয়া একমুখ হাসিয়া যেন লজ্জায় মুখ নামাইল। এমন মিঠে আওয়াজে, চেনা গলায় কে ডাকে ওই? ইন্দু চাহিয়া দেখিল,—তাই ত, এ যে তারই প্রভাত! চারি চক্ষে মিলিল, নয়নে নয়নে হাসি উথলিয়া উঠিল! ইন্দুর মনের মেঘ কাটিয়া গেল। এতক্ষণে ইন্দুর হৃদয়ে আনন্দের হিল্লোল দেখা দিল।

এইবার 'কনে' ধরিবার পালা। চারিজন বাহকের মধ্যে প্রভাতেরই কিছু বিপদ্! প্রভাত পীড়ি ধরিতে না ধরিতে তাঁহার পৃষ্ঠদেশে কিল পড়িতে আরম্ভ হইল,—কোমলাঙ্গীদের হস্তের

কিলে কোমলত্ব থাকিবে, রসিকেরা এইরূপই আশা করেন, কিন্তু প্রভাত কিছু অরসিক, তিনি অবলা-বৃন্দের মুষ্টিযোগে তেমন রস উপযোগ করিতে পারিলেন না। প্রভাত শ্যালাজের সুকোমল কর-পল্লবের মুষ্টি-ফল ভাদ্রমাসের তালের ন্যায় পৃষ্ঠে অনুভব করিয়া সহযোগী সম্বন্ধীকে উল্লেখ করিয়া বলিলেন, "ভাই, তুমি যাহার কোমল সংস্পর্শে সুখ কি দুঃখ অনুভব করিতে পার না - একেবারে বিভোর হইয়া পড়,—

স এবায়ং তস্যাস্তুহিনকরকোপম্যসুভগো
ময়া লব্ধঃ পাণিঃ।

কিন্তু আমার ভাগ্যে বিপরীত ফল। তোমার নিকট যাহা "মৃদূনি কুসুমাদপি', আমার কপাল-গুণে তাহাই 'বজ্রাদপি কঠোরাণি।' "

প্রভাত শ্যালাজকেও এই মর্ম্মে বিদ্রূপ করিতে ছাড়িলেন না! তার পর সাত পাক আরম্ভ হইল। প্রভাত চারুর কাণে কাণে বলিলেন, "চারু, আমি আছি, তোমার দাদা আছেন, পাত্রও আছেন, এর মধ্যে সাত পাকের বাঁধাবাঁধিটা কার সঙ্গে হ'লে

ভাল হয় বল ত ?” চারু অনেক কষ্টে হাসি চাপিয়া অন্যের অলক্ষ্যে প্রভাতবাবুর হাতে একটি সোহাগের চিমটী কাটিলেন, এটি কিন্তু কুসুমের মত মৃদুই বটে !

শুভদৃষ্টির সময় আসিল, চারিদিকে লাল আলো জ্বলিয়া উঠিল—পুরাঙ্গনাগণ হুলুধ্বনি দিয়া উঠিলেন—পাত্র মন্মথবাবু সেই সময় একবার প্রাঙ্গণ হইতে হুলুধ্বনির উদ্দেশে উপরে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলেন। দেখিলেন, এক অলোকসামান্যা যুবতী, সুন্দর বসন-ভূষণে বিভূষিত হইয়া রমণীমণ্ডলীর অগ্রে দাঁড়াইয়া তাঁহাকে দেখিতেছেন !

সেই হরিণাক্ষীর স্নিগ্ধ-চঞ্চল আঁখির সহিত মন্মথের আঁখি মিলিল ! কি মনোমোহিনী মূর্ত্তি ! মন্মথ আর একবার সে প্রতিমা দর্শনের লোভ সংবরণ করিতে পারিলেন না, সতৃষ্ণ-নয়নে লোলুপ-দৃষ্টিতে উপরে চাহিলেন ! নয়নে নয়নে মিলিতে না মিলিতে, সে স্থির সৌদামিনী-মূর্ত্তি নয়ন নত করিয়া ত্রস্তে পশ্চাতে রমণীমণ্ডলে লুকাইল, চপলা যেন মেঘে মিশিয়া গেল ! চপলারই মত সেই

চারুর চাঁদপানা মুখ দেখে সে নিজেই জল হয়ে গেছে।” পশ্চাৎ হইতে কোন ভামিনী যেন একটু বিরক্তির সহিত বলিয়া উঠিলেন,—“বুড়ামাগীদের বাতিক দেখে বাঁচিনে, নাত্‌জামাই জল হয়েছে, সে ত ভালই, তোদের বায়ুবৃদ্ধি হয়েছে, তোরা গোটা কত ডুব দিয়ে ঠাণ্ডা হ’য়ে নে।” এই-প্রকার বাক্‌বিতণ্ডায় বাসরের আসর খুব জমিয়া উঠিল! কিন্তু তখনও মৌন-অবলম্বনে। পাত্রের এই তূষ্ণীম্ভাব অবলোকনে, বাসরের চির-প্রথামত, জামাইয়ের মুখ ফুটাইবার জন্য সুন্দরীদের মধ্যে কেহ কেহ ষষ্ঠীদেবীর নিকট ফুটকড়াই মানিলেন। আর মন্মথকে ইতস্তত দৃষ্টিবিক্ষেপ করিতে দেখিয়া ডাক্তার-গিন্নি, হাস্যমুখে জিজ্ঞাসা করিলেন, “নাত্‌জামাই, গো-চোরের মত অমন ফ্যাল্‌ফ্যাল্ করে এদিক্ ওদিক্ দেখ্‌চ কি?” মন্মথের চক্ষু সত্যই একজনের সন্ধানে ফিরিতেছিল, সেটি অবশ্য “কনে” নহে, কেন না, কনে চারু আপাদমস্তক নীল চেলিতে আবৃত হইয়া শুধু মুখখানি বাহির করিয়া পাত্রের বামদেশে কলাবৌটির মত বসিয়া-

ছিল, তাহার সমবয়সীরা মাঝে মাঝে ফিস্‌ফিস্‌ করিয়া তাহার কাণে কাণে কি বলিতেছিল, আর হাসিয়া কুটিকুটি হইতেছিল, চারুও অবশ্য তাহাতে যোগ দিতেছিল। বিবাহের রাত্রে বালিকা 'কনে' লজ্জার বড় ধার ধারে না। মন্মথের চক্ষু যখন অভিসারে ধরা পড়িয়া গেল, তখন মন্মথ যেন একটু অপ্রস্তুত হইয়া পড়িলেন, কিন্তু এই অবলা-সমিতির নিকট প্রবলপ্রতাপান্বিত পুরুষবংশাবতংস মন্মথ একেবারে বোকা বনিয়া যাইতে প্রস্তুত ছিলেন না, কাজেই ডাক্তারগিন্নির পাল্‌টা গাহিলেন ; বলিলেন, "এখানে ব্যবসায়ের কোন সুযোগ হয় কি না, তাই দেখিতেছিলাম।" ডাক্তারগিন্নি বিদ্রূপটা গায়ে মাখিলেন না, কথাটা ফিরাইয়া দিলেন ; বলিলেন, "ভাই, তোমার মুখ-পোড়ানই সার হ'লো, সীতা-উদ্ধার হ'লো না, মিছে তোমার কষ্ট ক'রে আসা, এখানে সে ব্যবসায়ের কেউ নেই, তুমি এখন পথ দেখ।" এইরূপে কথা-কাটাকাটি বাধিয়া গেল। বাসরের খোলা বড় তপ্ত হইয়া উঠিল, মন্মথের মুখে খই ফুটিতে লাগিল, দু'টা একটা তপ্ত ছিটে সুন্দরী-

গণের গায়েও পড়িল। সুন্দরীগণ এতক্ষণে বুঝিলেন, ফুটকলাই মানাটা বাজে খরচ হইয়াছে। এইখানে বলিয়া রাখি, বাসরের এই ঠাকুরাণী দিদিরা সকলেই কিছু আসল 'ঠান্‌দি' নন। ইহার মধ্যে নকলও আছেন; আছেন কেন, নকলই অধিক। অনেক শ্বশ্রূসম্পর্কীয়া ঠাকুরাণীও কেহ বা বৈষ্ণব-বৌ, কেহ বামুণদিদি, কেহ সরকারগিন্নি নামে ছদ্মবেশে ঠাকুরাণী দিদির দলে মিশিয়াছেন। বিস্তারিত পরিচয় দিব কি? পাঠিকা মহাশয়ারা কি বলেন? না—আর অপ্রতিভ করিয়া কাজ নাই। তবে ভবিষ্যতের জন্য সাবধান হইলেই হইল।

ইন্দু এতক্ষণ পশ্চাতে ডাক্তারগিন্নি প্রভৃতি মহারথিবৃন্দের অন্তরালে বসিয়া, ঠাকুরাণী দিদিদের "কবির লড়াই" শুনিতেছিল। ডাক্তারগিন্নি কিন্তু এতক্ষণের পর তাহাকে আসরে নামিবার জন্য "ছটে-পটে" ধরিয়া বসিলেন। ইন্দু কিন্তু ঠাকুরাণী দিদির কথা রাখিতে পারিল না। অত লোকের সম্মুখে বাচালতা প্রকাশ করা ইন্দুর,

কাজ নয়। বিশেষ ছদ্মবেশী অনেক গুরুজন সেখানে বসিয়া আছেন। ডাক্তারগিন্নি তবু ছাড়েন না—"ইন্দু, তোর হ'লো ভগিনীপতি—বোনাই। তা আবার যে-সে বোনাই নয় লো, সোদ্দর বোনাই, তুই কি না আছিস চুপ্‌চাপ্‌! তা হ'লে আমাদের কি গরজ, আমরা কেন বাসর জেগে, মুখ ব্যথা করে মরি। একেই বলে, 'যার বিয়ে তার মনে নেই, পাড়াপড়শির ঘুম নেই।' "

ইন্দু বুঝি ডাক্তারগিন্নির কাণে কাণে কি বলিতে যাইতেছিল, এমন সময়ে ঠাকুরাণী দিদির দলের কে একজন বলিয়া উঠিলেন, "হচ্চে তোমাতে আর নাত্‌জামায়ে পাল্টা-পাল্টি, যার নাম ষাঁড়ে ষাঁড়ে যুদ্ধ, এর মধ্যে গিয়ে ইন্দু কি ক'র্‌বে বল?" বাসর-গৃহে আর একটা হাসির তরঙ্গ বহিয়া গেল। ইন্দুর মধুর অধরেও মধুর হাসি ফুটিয়া উঠিল। সেই মৃদু হাস্যে ইন্দুর প্রফুল্ল মুখ-কমলের উপর যেন জ্যোৎস্না খেলিয়া গেল। বিস্মিত মন্মথ দেখিলেন, এই সেই মূর্ত্তি! শুভ-দৃষ্টির সময়ে, এই স্বর্ণ-প্রতিমার বিকীর্ণ জ্যোতিই

মন্মথের হৃদয় উদ্বেলিত করিয়া দিয়াছিল। আর এতক্ষণ ইহারই অন্বেষণে মন্মথের চঞ্চল চক্ষু ইতস্তত ধাইতেছিল। ওই যে মধুমাসের পুষ্পিতা লতা, ওই যে বৈশাখের মুকুলিতা আম্রশাখা, ওই যে হেমন্তের কার্ত্তিকী রাকার ন্যায় অথবা ততোধিক মনোহর রূপ-মাধুরী, সে কি ইন্দুর? যে রূপ দেহে ধরে না, ভাদ্রের ভরা গঙ্গার মত যে রূপ উছলি উছলি পড়িতেছে, সে রূপের অধিকারিণী কি তবে মন্মথের ঠাকুর-ঝি ইন্দু! হায়,—এই ইন্দুর সহিতই মন্মথের বিবাহের কথা হইয়াছিল। মন্মথ তখন কেন সে বিবাহে সম্মত হয় নাই! চারু সুন্দরী বটে, কিন্তু ইন্দুর কাছে কি? পূর্ণিমার পূর্ণ-শশধরের মাধুরী-মুগ্ধ নয়নে কি দ্বিতীয়ার ক্ষীণচন্দ্রের ম্লান শোভা ধরে? চারু যে শুধু কুসুম-কলিকা, সে রূপ ফুটে ফুটে ফুটে না, আর ইন্দু যেন বসোরার প্রস্ফুটিত গোলাপ! রূপ-রস-গন্ধে মন্মথের মত্ত মন-ভৃঙ্গ তাহা হইতে উঠে উঠে উঠে না!

মন্মথ ভাবিতেছেন, কেন আমি "ভাঙিনু মঙ্গল-

ঘট নিজ পদাঘাতে।” এদিকে ডাক্তারগিন্নি কিন্তু বলিয়াই চলিয়াছেন,—“ইন্দু, তোর কি আজ চুপ ক’রে থাকা ভাল দেখায় না? আজ যে তোর পাথরে পাঁচ কিল, খোরায় এক লাথি! তোর যে আজ পতিতে পতিতে ধূলপরিমাণ।” ইন্দুর সই বলিয়া উঠিল, “দেখনহাসির ও আবার কি কথা! পতির ধূলপরিমাণ কি গো?” ডাক্তারগিন্নি বলি-লেন, “কেন, এক নম্বর নিজের পতি, দুয়ের নম্বর ভগিনীপতি, জানিস্ই ত, ভগিনীপতি হ’লো নিজপতি।” ডাক্তার-গিন্নির বাড়াবাড়ি দেখিয়া ব্রীড়াবনত মুখে ইন্দু বাসরগৃহ ত্যাগ করিল, তার সইও সঙ্গে সঙ্গে উঠিল, কিন্তু যাইবার সময় ডাক্তারগিন্নিকে এক খোঁচা দিয়া গেল; বলিল, “দেখনহাসিদের বুঝি ঐ নিয়ম!”

ইন্দুর শাপে বর হইল। কত দিনের পর, আজ স্বামী আসিয়াছেন, তাঁহার সহিত দেখা করিবার জন্য এতক্ষণ ইন্দুর মনটা আকুলি ব্যাকুলি করিতেছিল—“চঞ্চল চরণ দুটি, যেন যেতে চায় ছুটি,” কিন্তু লজ্জা আসিয়া বাধা দিতেছিল—পাছে

কেহ বিদ্রূপ করে। এখন ইন্দু বড় ফাঁকি দিয়া পলাইল, শাপে বর হইল!

*　　*　　*　　*

আহারের জন্য মন্মথের ডাক পড়িল। আহার করিতে করিতে মন্মথ অন্য অন্য কথা-প্রসঙ্গে ইন্দুর কথা তুলিয়া বাল্য-বন্ধু প্রভাতকে বলিলেন,—"ভাই, তোমারই জিত।" প্রভাত সহাস্যে উত্তর দিলেন,—"কেন? আর আমার চেয়ে তোমারই বা হার হ'লো কিসে?" মন্মথ—"এই ধানে, আর তুষে!"

*　　*　　*　　*

"ছি! ও আবার কি কথা," প্রভাতের আলিঙ্গনাবদ্ধা ইন্দু ঈষৎ কোপকুটিল-কটাক্ষে তাঁহার কি-একটা কথার উত্তরে বলিল, "ছি! ও আবার কি কথা, ও সব ঠাট্টা আমার ভাল লাগে না কিন্তু।" "ঠাট্টা নয় ইন্দু, সত্যই তোমার রূপ মন্মথের চক্ষে বড় ধরেছে। সে তাই আমাকে বল্‌ছিল,—তবে শেষ কথাটা আমার বলা বটে" বলিয়া প্রভাত ইন্দুর মুখচুম্বন করিলেন। উভয়ত্র

আলিঙ্গন কিছু গাঢ় হইল। কিন্তু সহসা যেন কোথা হইতে দম্পতির শাদা মনে একটা বিষাদের ক্ষণিক ছায়া পড়িল!

* * * *

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

—— * ——

মন্মথ বিবাহের প্রায় এক বৎসর পরে শ্বশুর-বাড়ী আসিয়াছেন। কিন্তু চারু আজও ছেলে-মানুষ। তাকে 'ধরে বেঁধে' মন্মথের ঘরে দিয়া আসিতে হয়। মন্মথ, চারুকে কথা কহাইবার জন্য কত চেষ্টা করেন, চারু কিন্তু কলাবৌটির মত একহাত ঘোম্‌টা টেনে, 'গুটিসুটি' হ'য়ে, বিছানার এক পাশে জড়ের মত পড়ে থাকে! মন্মথ কত ডাকে, কত সাধে, কত অভিমান করে, কখনও রাগও করে, কিন্তু চারু ফিরে চায় না! কত হা'হুতাশ, কত দীর্ঘশ্বাস, নিষ্ঠুর চারু তবু কথা কয় না! চারুর মা ও খুড়ি, দুইএকদিন 'আড়ি' পাতিয়া, জামাই বেচারার এই দুর্দ্দশা দেখিলেন। চারুর এই ব্যবহারে জামাই পাছে সত্যই বিরক্ত হন, মা ও খুড়ির এই এক আশঙ্কা জন্মিল; তাই চারুকে কোনরূপে 'জাগান' দিয়া, 'রাতারাতি'

যুবতীভাবাপন্ন করিবার জন্য তাঁহাদের বিশেষ চেষ্টা পড়িয়া গেল। চারুকে তাঁরা কখনও বকিতেন, কখনও ভয়, কখনও বা লোভ দেখাইতেন, কিন্তু কেমন 'একগুঁয়ে' মেয়ে চারু, সে সব কথা সে কাণেই তুলিত না! এজন্য চারুকে এক-আধ দিন মার কাছে একটু বেশীরকম লাঞ্ছিতও হইতে হয়; কিন্তু তবু চারু বাগ মানিল না। কিছুতেই কিছু হইল না দেখিয়া, মা ও খুড়ি, হারি মানিলেন। ইতিমধ্যে চারুর দিদি ইন্দু শ্বশুরবাটী হইতে আসিল। ইন্দু আসিলে তার মা ও খুড়ি হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলেন; ইন্দুকে বলিলেন, "আমরা ত চারুকে 'এঁটে উঠতে' পাল্লেম না, এখন বাছা, তুই যা পারিস্ কর্। চারু ত তোর কথা শোনে, তুই কেন রাত্রে তাকে সঙ্গে করে মন্মথের ঘরে নিয়ে যাস্‌নে?" ইত্যাদি।

পিতা মানসিংহ কর্তৃক সেনাপতি-পদে অভিষিক্ত জগৎসিংহ যেমন উল্লাসে, গর্ব্বে, স্বীয় রণ-পাণ্ডিত্য দেখাইবার জন্য প্রাণপণে সচেষ্ট হইয়াছিলেন, ইন্দুও তেমনই এই ব্যাপারে কৃতিত্ব

দেখাইতে, আপনার সমস্ত কৌশল, সমস্ত প্রয়াস নিয়োজিত করিল।

ইন্দু এখন প্রতিরাত্রে চারুকে মন্মথের ঘরে দিয়া আসে, নানারূপ কথাবার্ত্তায় চারুর মুখ ফুটাইতে ও লজ্জা ভাঙিতে চেষ্টা করে। মন্মথ একদিন তাস খেলিবার কথা তুলিল; ইন্দু দেখিল, পরামর্শটা মন্দ নয়, এই উপায়ে, মন্মথের সহিত চারুর ভাবটা সহজে হইতে পারিবে; কেন না, সে জানিত, চারু খেলা তেমন জানুক না জানুক, খেলিতে কিন্তু তার ভারি উৎসাহ। তা হ'লে কি হয়, চারু ত সহজে মন্মথের সঙ্গে খেলিতে 'রাজি' হয় না। "বরের সঙ্গে আবার খেলা, ছি! দিদির যেমন কাচ!" কিন্তু দিদি যে কিছুতেই ছাড়ে না, একে দিদির বকুনি, তাতে মায়ের অপমানের ভয়, চারু কি মুস্কিলেই পড়েছে গা! চারু মনে মনে মা দুর্গা, কালী, কত দেবতাকেই মানে, "কবে ও আমাদের বাড়ী থেকে যাবে," কিন্তু কেমন নিষ্ঠুর দেবতা, তার মিনতি কেহ শুনে না। শেষ আর কি করে, দুইএকদিন দেখিয়া, চারু

অগত্যা খেলিতে স্বীকৃত হইল, কিন্তু ঘোমটা কিছুতেই কমাইল না। দিদি চলিয়া গেলে, চারুর আর খেলা হইত না, কাজেই ইন্দুকে বসিয়া থাকিতে হইত। বাজী শেষ হওয়া পর্য্যন্ত সব দিন চারুর ধৈর্য্য থাকিত না! সে খেলিতে খেলিতে প্রায়ই ঘুমাইয়া পড়িত। মন্মথের অনুরোধে ইন্দু সে বাজীটা শেষ না করিয়া যাইতে পারিত না। রাত্রির এই বন্দোবস্তে কিন্তু ইন্দুর উদ্দেশ্য সফল হইল না, চারুর মুখ ফুটল না। দিদি চলিয়া গেলেই আবার যে চারু সেই চারু! বিশেষত চারু মধ্যে প্রায়ই সন্ধ্যা হইতে না হইতে ঘুমাইয়া পড়িত। কাজেই দিনমানেও চারুকে মন্মথের ঘরে আনিবার বন্দোবস্ত করিতে হইল। চারু অনেক কান্নাকাটি-আপত্তি করিল, কিন্তু কে তার কথা শুনে বল? শেষ দু'পুর বেলাতেও চারুকে দিদির সঙ্গে ঘরে আসিতে হইত, কিন্তু সে দিদির আঁচল ছাড়িত না। দিদিকে মাঝে রাখিয়াই কোনদিন 'দেখা বিন্তি,' কোনদিন বা 'গোলাম-চোর' খেলা হইত। বিন্তিখেলায়, মন্মথ ইচ্ছা

করিয়া মাঝে মাঝে খেলার নিয়ম ভাঙিত ; চারুর সেটা অসহ্য হইত, সে নিজে মুখ ফুটিয়া মন্মথকে কিছু বলিতে পারিত না বটে, কিন্তু দিদিকে তথনই কাণে কাণে বলিত—"ও কি! অমন কেন?" আবার গোলাম-চোরে, মন্মথ প্রায়ই সাধ করিয়া "গোলাম-চোর" হইত। চারুর তাতে ভারি আনন্দ, ভারি উৎসাহ। সে সময়, চারুর অজ্ঞাতে তার ঘোমটা একটু সরিয়া যাইত, কোনদিন হয় ত সেই মুহূর্ত্তে মন্মথের সহিত, তার "চোকোচোকি" হইয়া যাইত, মন্মথের চক্ষে হাসি ফুটিয়া উঠিত। সে হাসি যেন "হেরে গিয়ে হেসে চাওয়া।" চারু কিন্তু তাহাতে বড় অপ্রতিভ হইত, লজ্জায় মুখ নামাইত! অঙ্গুলিস্পর্শে লজ্জাবতী লতা যেমন "গুটিসুটি'' হইয়া যায়, চারু তেমনই জড়সড় হইয়া পড়িত, কোনদিন বা পলাইয়া যাইত। বেশী পীড়াপীড়ি ভাল নয় বলিয়া, ইন্দুও তাহাতে আর আপত্তি করিত না। চারু চলিয়া আসিলেও ইন্দু মন্মথের সহিত গল্প করিত। তবে প্রায়ই ইন্দু দুইএকজন 'সমবয়সী' বা দুইএকজন ঠাকরুণ

দিদি, সে সময়ে আসিয়া জুটিতেন; নানা রকমের কথাবার্ত্তা, হাসি-তামাসা চলিত। মন্মথ বেশ মিষ্টি মিষ্টি মজার মজার গল্প করিতে পারিত; সে গল্প শুনিতে ইন্দুর বড় ভাল লাগিত। ক্রমে মন্মথের সহিত তাসখেলা ও গল্প করা ইন্দুর একটা নেশা হইয়া দাঁড়াইল! মন্মথ যদি আহারান্তে দৈবাৎ বাহিরে যাইত, ইন্দু অমনি মন্মথকে ডাকাইতে পাঠাইত। আসিতে বিলম্ব হইলে, অভিমান করিত। মন্মথ শীঘ্রই ইহা বুঝিল; বুঝিয়া কি জানি কেন, ইচ্ছা করিয়া মাঝে মাঝে আসিতে বিলম্ব করিত। শেষ আবার সাধিয়া ঠাকুরঝির অভিমান ভাঙাইত! কে জানে, এ খেলা খেলিয়া কি লাভ? সরলা ইন্দু অত-শত বুঝিত না, সে অকপটে মন্মথকে বিশ্বাস করিত; মন্মথ যেন তার 'সমবয়সী'। এইরূপে আমোদে-আহ্লাদে, হাসি-গল্পে দিন কাটিতে লাগিল। ক্রমে মন্মথের প্রতি ইন্দুর স্নেহ ও বন্ধুত্ব গাঢ় হইতে গাঢ়তর হইল। ইন্দু চারুকে ধরিয়া দিবার জন্য জাল বিস্তার করিয়াছিল, এখন ঊর্ণনাভের

মত, সে জালে অজ্ঞাতে আপনিই জড়িত হইতে লাগিল!

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

—— ◦ ——

"কলিকাতা"; * * নং বেচু চাটুর্য্যের লেন।

২৯শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩০১।

"ইন্দু!

"কয়দিন তোমার চিঠিপত্র পাইতেছি না কেন? ভাল আছ ত? বাড়ী হইতে প্রসন্নপুর যাইবার পূর্ব্বে লিখিয়াছিলে, 'সেখানে গিয়া খুব ঘনঘন পত্র দিব।' কিন্তু এ দুই সপ্তাহের মধ্যে, কেবলমাত্র একখানি চিঠি দিয়াছ, এরই নাম, 'যে বা রোগী ছিল বসে, বৈদ্যে শোয়ালে এসে।'

"তোমার পত্র পাইতে বিলম্ব হইলে যে কত অধীর হই, তা ত তুমি জান? জানিয়াও যে ইচ্ছা করিয়া বিলম্ব করিবে, এ বিশ্বাস ত হয় না! তাই এত ভাবনা।

"শুনিলাম, জামাইষষ্ঠীতে মন্মথ ভায়া তোমা-দের ওখানে আসিয়াছেন। চারুকে ত কতদিন

দেখি নাই। সে কত বড়টি হয়েছে? মন্মথের সঙ্গে বেশ কথাবার্ত্তা কয় ত?

"ইন্দু, চার-বছর আগে, তুমিও তখন তোমার বোন্‌টীর মত ছিলে, সে দিন মনে পড়ে কি? সে সব কথা মনে হ'লে বোধ হয় এখন তুমি খুব লজ্জিত হও, কিন্তু আমার পক্ষে এখন সে স্মৃতি বড়ই মধুর! তাই ব'লে আবার তোমাকে পাকা-গুটি কাঁচিয়ে বস্‌তে বলিনে, কেন না, সে দিন আর ফির্‌বে না বলেই সে সব স্মৃতি এত মধুর মনে হয়। আবার তেমনি ক'রে, তোমায় ভালবাসার পাঠশালে হাতে খড়ি দিয়ে, অক্ষরপরিচয় করাতে হ'বে, সে আশঙ্কাটা যদি থাকৃত, তবে হয় ত, তার নামেও চম্‌কে উঠ্‌তাম। কিন্তু সে ভয় আর নেই, এখন ত তোমার 'গুরুমারা বিদ্যা!'

"তা সে কথা থাক্। আজকাল বোধ হয় তোমরা খুব আমোদে আছ? তা বেশ। কিন্তু দেখো, যেন নূতন আমোদ পেয়ে, পুরোণোদের একেবারে ভুলো না। শাস্ত্রের বিধিটা যেন মনে থাকে,—'সেবকান্ন পুরাতনঃ।'

"এখন, তামাসা থাক্। সত্যই তোমার পত্রের জন্য পথ চেয়ে আছি। কেমন আছ? আমি অমনই বেঁচে আছি! এখন বিদায়। ইতি—

"তোমারই প্রভাত।"

চিঠিখানি যে ইন্দুর স্বামীর, তা আর আমাদের পাঠক-পাঠিকাদের বলিতে হইবে না।

ইন্দু পত্রখানি পড়িয়া কি ভাবিতে ভাবিতে উপরের ঘরে যাইতেছিল। চিঠিখানি তখনও হাতে। সেই সময় মন্মথও নীচে নামিতেছিল, সিঁড়ির ঘরে উভয়ের দেখা হইল। মন্মথ হাসিতে হাসিতে জিজ্ঞাসা করিল, "ও কার চিঠি ঠাকুরঝি?" "কই, কারু নয়" বলিয়া, একটু হাসিয়া ইন্দু চিঠিখানি হাতের মুঠায় লুকাইল। মন্মথের প্রথমে যে সন্দেহটুকু ছিল, এখন তাহা দূর হইল। সে আবার হাসিতে হাসিতে বলিল, 'চিঠি দেখাবে বলেছিলে যে, দেখাও।' ইন্দু, "না না, সে চিঠি নয়," বলিয়া পাশ কাটাইতেছিল, মন্মথ পথ আট্‌কাইল, বলিল, 'চিঠি দেখাও, নইলে কিন্তু ছাড়্‌ব না।' ইন্দু চিঠির খানিকটা বাহির করিয়া

হাত দূরে রাখিয়া বলিল, "এই দেখ।" মন্মথ ক্ষিপ্রহস্তে চিঠিখানি লইতে গেল, ইন্দু সেই অবকাশে পলাইবার চেষ্টা করিতেছিল, কিন্তু পারিল না, মন্মথ তার হাত ধরিল! সহসা ইন্দুর হাসি-তামাসা সব বন্ধ হইয়া গেল। সে প্রফুল্ল মুখখানি গম্ভীর হইয়া উঠিল, খুব বিরক্তি ও দৃঢ়তার সহিত ইন্দু বলিয়া ফেলিল, "ও কি মন্মথ, হাত ছাড়।" মন্মথ অপ্রতিভ হইয়া, তাড়াতাড়ি হাত ছাড়িয়া বাহিরে চলিয়া গেল।

মন্মথ ইন্দুকে হাস্যময়ী চপলপ্রকৃতিই জানিত, বুঝি তাই এতটা সাহস করিয়াছিল; আজ, সেই চপলার ক্ষণিক প্রভাবে, সে একেবারে স্তম্ভিত হইল!

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

—— * ——

মন্মথ যখন বাহিরের ঘরে একাকী থাকিত, তখন ছোট ছোট বালক-বালিকার দল বড় মজা পাইয়া যাইত। কেহ একটা বটের পাতায় কতকগুলি ধূলা, দু'খানা খোলামকুঁচি, হ'লো বা গোটাকত তেলাকুচা আনিয়া বলিত, "মন্মথবাবু, খাও।" কেহ বলিত, "টুমি নাকি চারু ডিডির নাম করেছ? ওহো! বৌএর নাম করেছ, সব্বাইকে বলে ডেব।" কেহ বা মন্মথের হাত ধরিয়া টানিতে টানিতে বলিত, "টোমায় চারু ডিডি ডাক্‌চে।" মন্মথ ইহাদিগকে একআধবার যে তাড়াতুড়ি না দিত, তা নয়; কিন্তু আসলে সে বিরক্ত হইত না; বরং মাঝে মাঝে সেই ছেলেখেলায় যোগ দিত। মধুর রসের সম্বন্ধ না হইলে বুঝি এতটা মধুর ভাবের প্রবাহ বয় না।

এই সব বালক-বালিকার পশ্চাতে আর এক দল বালিকা থাকিত। তাহারা বাহিরে আসিবার

পথে, সদর দরজা ভেজাইয়া, তাহার ফাঁকে দাঁড়া-ইয়া দাঁড়াইয়া উঁকি দিয়া সব দেখিত। আর মাঝে মাঝে হাতছানি দিয়া, সেই ছোটদলকে ডাকিয়া, নূতন নূতন তামাসা শিখাইয়া দিত! মন্মথের সহিত চোখোচোখি হইলেই "ওলো দেখেছে লো" বলিয়া ঝম্‌ঝম্ রবে সেই বালিকার দল অন্দরের দিকে ছুটিয়া যাইত। আবার টিপি-টিপি আসিত, হাসিত, পলাইত। ইহারা চারুর অনেকটা সমবয়সী। মন্মথ অন্যদিন এ সব বেশ উপভোগ করিত। আজ ইহারা অনেকক্ষণ ছুটা-ছুটি, লাফালাফি করিল, কিন্তু মন্মথ সে দিকে বড় মনোযোগ দিল না। তখন সেই "গৃহ-হারা আনন্দের দল" যেন একটু ক্ষুণ্ণ হইয়া চলিয়া গেল। মন্মথ অন্যমনস্কভাবে একখানি ইজি চেয়ারে শুইয়া ঘুমাইবার চেষ্টা করিতেছিল, কিন্তু ঘুম আসিল না। মনটা বড় চঞ্চল। মুদ্রিতচক্ষু মন্মথ, কি একটা ভাবিতেছিল, এমন সময় শুনিল,—

"ঘুমুলে ঘুমুলে পাণ খেলে না,
পাণ সেজেছি এলাচ-দানা ;

ছোট ব'লে কি মনে ধরে না,
ছোট কি কখন বড় হবে না!"

মন্মথ হাসিয়া চক্ষু মেলিল দেখিল, সম্মুখে একটি কৃত্রিম পাণ হাতে দাঁড়াইয়া তাহার অষ্টম-বর্ষীয়া শ্যালিকা হেম। মন্মথ তাহাকে যেই হাত বাড়াইয়া ধরিতে গেল, সে অমনি পাণটি মন্মথের গায়ে ছুড়িয়া হাসিতে হাসিতে একদৌড়ে পলাইয়া গেল। এমন সময় কে ডাকিল, "জামাইবাবু! 'দিদিমণি' আপনাকে ডাকচে।" সে ডাক বীণা-ধ্বনির মত মন্মথের কাণে বাজিল। মন্মথ তখন কাঁচপোকায় আকৃষ্ট আরসুলার মত ঝির অনুসরণ করিল।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

---*---

মধ্যাহ্নের সেই ঘটনার পর মন্মথ বাহিরে চলিয়া গেলে, ইন্দুমনে মনে বড় অপ্রতিভ হইল। আজ সহসা কোথা হইতে তার এতটা দৃঢ়তা আসিল। সে নিজেই একটু বিস্মিত হইল। ভাবিল, কাজটা ভাল হয় নাই। ভগিনীপতি হাত ধরেছিল, তা সেটা আর এমন দোষের কি হয়েছে? সবারই ভগিনীপতি এমন ধরে! তখন আর কোন কথা ইন্দুর হৃদয়ে ঠাঁই পাইল না, শুধু মনে হইল, তার এই ব্যবহারে না জানি মন্মথ কত কষ্টই পেয়েছে! ছি! ইন্দু অপ্রতিভ হইয়া আপন মনে জিভ কাটিল।

সেদিন বৈকালে অন্যদিনের চেয়ে 'সকাল সকাল' মন্মথের জলখাবারের ডাক পড়িল। অন্য-দিন মন্মথের শাশুড়ী তাকে জলখাবার দেন, আজ ইন্দু জলখাবার দিতেছে। ইন্দু জলখাবার দিল বটে, কিন্তু মুখ তুলিয়া মন্মথের দিকে চাহিতে পারিল না। নতমুখে বলিল, "মন্মথ জল খাও।"

মন্মথ প্রথম ভাবিয়াছিল, বুঝি আজ জলখাবারে কিছু ভেল আছে, কিন্তু মধ্যাহ্নের ঘটনায় সে সন্দেহ তার মনে আর স্থান পাইল না। সে ইন্দুর মুখের দিকে চাহিল, দেখিল, তখনও ইন্দু অবনতমুখী মন্মথ মুগ্ধনেত্রে দেখিল, সেই অপ্রতিভ-অপ্রতিভ মুখে আজ এক অপূর্ব্ব শ্রী ফুটিয়া উঠিয়াছে। মন্মথ ব্যাপার বুঝিল, মনে মনে হাসিয়া ডাকিল, "ঠাকুর-ঝি!" ইন্দু মুখ তুলিল, চারিচক্ষে মিলিবা-মাত্র উভয়েই হাসিয়া ফেলিল। লজ্জার বাঁধ ভাঙিয়া গেল। সেখানে আর কেহ নাই দেখিয়া, মন্মথ সপ্রতিভভাবে বলিল, "কই—চিঠি!" চিঠি ইন্দুর আঁচলে বাঁধা ছিল, একটু হাসিয়া চিঠিখানি খুলিয়া ইন্দু মন্মথের হাতে দিল। মন্মথ পত্রখানা আগাগোড়া পড়িল, পড়িয়া ফিরাইয়া দিল। কিন্তু একটা তামাসার লোভ সংবরণ করিতে পারিল না,—তামাসার মাত্রাটা কিছু বেশী চড়িল—"যাও ছি! অমন কল্লে কিন্তু আর আস্‌ব না," বলিয়া গমনোদ্যতা ইন্দু যেন ঈষৎ কোপকুটিল-কটাক্ষে মন্মথের দিকে চাহিল। সে অপাঙ্গে বুঝি একটু

হাসিও খেলিয়াছিল। তখন 'যাই' বলিয়া হাসিতে হাসিতে মন্মথও বাহিরে গেল।

মন্মথ কাল বাড়ী যাইবে, আজ রাত্রে তাই খেলার ধুমটা একটু বেশী। "অনেক রাত হয়েছে, এখন যাই" বলিয়া ইন্দু একবার উঠিতে চাহিতে-ছিল, কিন্তু মন্মথ বাধা দিল; বলিল, "রাত আর কই হয়েছে, আর আজকের রাত বই ত নয়।" ইন্দু ভাবিল, তা বটে। সরলা বালিকা আবার খেলিতে বসিল। চারুর তখন অর্দ্ধেক রাত্রি।

ঝম্ ঝম্ ঝম্,—বাহিরে মুষলধারে বৃষ্টি পড়িতেছে। গুরুগুরু দুরুদুরু গভীর গর্জ্জনে মেঘ গর্জ্জিতেছে। সেই "ঘন ঘোর বাদল" নিশীথে, ইন্দু আর মন্মথ খেলিতেছিল, গল্প করিতেছিল, হাসিতেছিল, আর ইন্দু মনে মনে মন্মথের রসিক-তার প্রশংসা করিতেছিল। রাত্রি গভীর, সংসার সুষুপ্ত, কেবল মন্মথ আর ইন্দু খেলায়, গল্পে, হাসিতে বিভোর! সেই বিভোর অবস্থায় খেলিতে খেলিতে কি একটা কারণে তাস লইয়া উভয়ের মতদ্বৈধ ঘটিল। ক্রমে তাস লইয়া টানাটানি,

কাড়াকাড়ি, হাসাহাসি আরম্ভ হইল। সহসা গৃহমধ্যে প্রচণ্ডবেগে একটি 'দম্‌কা' বাতাস প্রবেশ করিল। প্রদীপ নিবিয়া গেল! গৃহের সঙ্গে সঙ্গে একটি জীবনও অন্ধকার হইয়া গেল!

ধীরে, অতি ধীরে, ইন্দু সে গৃহ ত্যাগ করিল। উদ্বেলিতকণ্ঠে মন্মথ ডাকিল, "ঠাকুর-ঝি!" ইন্দু ফিরিল না। বুঝি সে কথা তার কাণে গেল না।

মন্মথ পরদিন অতি প্রত্যূষে বাড়ী চলিয়া গেল। চারু আবার হাসিয়া খেলিয়া ছুটিয়া বেড়াইতে লাগিল। কয়েদী যেমন জেলখানা হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া মুক্ত বাতাসে আপনাকে স্বচ্ছন্দ মনে করে' সে তেমনি হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল। ইন্দু কিন্তু বড় বিমর্ষ। এই বিষণ্ণভাব দেখিয়া ডাক্তারগিন্নি' ইন্দুর মুখের কাছে হাত নাড়িয়া সুর করিয়া বলি-লেন,—

"সোণার নাতিনী, এমন যে কেনি
হইলি বাউরি পারা,
সদাই রোদন, বিরস বদন,
না বুঝি কেমন ধারা।

যমুনা যাইতে, কদম্ব-তলাতে,
দেখিলি যে কোন জনে ?
যুবতী-জনের ধরম-নাশক
বসি থাকে সেইখানে।
সে জন পড়ে তোর মনে।
সতীর কুলের, কলঙ্ক রাখিলি
চাহিয়া তাহার পানে।"

ইন্দুর সমবয়স্কারাও বিদ্রূপ করিতে ছাড়িল না। কেহ বলিত, "নে ভাই ইন্দু, তোর আর বাড়াবাড়ি দেখে বাঁচিনে। ভগিনীপতি তো সবারই আছে লো!" কেহ বা সুর আর একটু চড়াইল, "কি লো, মন্মথ গিয়ে তুই যে একেবারে র'য়ে গেলি। লোকের বর বিদেশে গেলেও ত এমন হয় না!"

ইন্দুর মাও ক্রমে ইন্দুর এ পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিলেন; বলিলেন, "ইন্দু! তোর হলো কি? দিনরাত অমন করে কি ভাবিস্ বল্‌তো, দিন্‌কের দিন যে শুকিয়ে উঠ্‌লি।"

ইন্দু কোন উত্তর দিত না। শুধু নতমুখে, কাঁদকাঁদ হইয়া থাকিত। কোন দিন বা অন্যের অলক্ষ্যে কাঁদিয়া ফেলিত।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

আজ অনেক দিনের পর প্রভাত ইন্দুর হস্তাক্ষর পাইলেন, সাগ্রহে তাড়াতাড়ি পত্র খুলিলেন—

"প্রিয়তম!

"সত্যই এ পোড়ারমুখী তোমায় ভুলিয়াছিল, নহিলে এমন গুরুতর পাপ করিবে কেন! আমার এ অপরাধের ক্ষমা নাই! তোমাকে অনেক কথা লিখিব বলিয়া এ পত্র লিখিতে বসিয়াছিলাম, কিন্তু আজ আর তা পারিলাম না। সকল কথা পরে লিখিব কেমন আছ? ইতি—

"পাপিষ্ঠা
ইন্দু"

"একি এ! একি আমার ইন্দুর পত্র! হাঁ, ইন্দুর হস্তাক্ষরই ত বটে।" প্রভাত একবার দুইবার তিনবার কতবার পত্র পড়িলেন, কিছুই ঠিক করিতে পারিলেন না। প্রভাতের মনে কত রকমের অনুমান উঠিতে লাগিল, শেষ পত্র বন্ধ করিয়া প্রভাত

ভাবিলেন, "ছি! আমি কি পাগল! কিন্তু—কিন্তু ইন্দু এমন করিয়া পত্র লিখিল কেন?" আবার ঐ কথা! শেষ প্রভাত সিদ্ধান্ত করিলেন, আমোদে মত্ত হইয়া আমায় পত্র দিতে বিলম্ব করিয়াছে বলিয়া ইন্দু নিজেই বড় অপ্রতিভ হইয়াছে। তাই অনুতাপ করিয়া এমনতর লিখিয়াছে। এ সামান্য কথাটাও এতক্ষণ বুঝিতে পারি নাই। আমি কি নির্ব্বোধ! প্রভাত ফেরত ডাকে উত্তর দিলেন—

"আমার ইন্দু!

"পত্র দিতে বিলম্ব হইয়াছে, তা এত লজ্জা কি? আর এই সামান্য কারণে এমন অপরাধীর মত পত্র দিয়াছ কেন? এ ত অতি তুচ্ছ কথা, যদি প্রকৃতই তুমি না বুঝিয়া কোন গুরুতর অপ-রাধ করিয়া, এমনই করিয়া অনুতপ্ত হইয়া, আমায় জানাও, আমি তোমার সে প্রথম অপরাধও মার্জ্জনা করিতে প্রস্তুত। যা হোক, এর জন্য এত অপ্র-তিভ হবার কারণ নাই। তুমি যে আমায় ভুলিতে পার না, তা আমি বেশ জানি। কিন্তু এমন

করে পত্র দিতে আর দেরী করো না! লক্ষ্মী আমার!

"অন্য অন্য কথার উত্তর দাও নাই কেন?

"চারুদের কেমন ভাব হলো জানিতে উৎসুক আছি। মন্মথ এখন কোথায়?

"কেমন আছ। আমি ছুটীর চেষ্টায় আছি। ছুটী পেলেই তোমায় আনিতে যাইব। আর যদি এর মধ্যে অন্য সুযোগ পাই, তবে ততদিনও অপেক্ষা করিতে হবে না। এ সু-খবরের জন্য কি খেতে দেবে দাও। ইতি।"

ইন্দু যথাসময়ে এ পত্রের উত্তর দিল—

"তুমি আমার অপরাধ যত সামান্য মনে করিতেছ, আসলে তা নয়। পাপিষ্ঠা আমি, তোমার নিকট অবিশ্বাসিনী হইয়াছি, আমায় লইয়া তুমি কি আর সুখী হইতে পারিবে? একদিন বিস্তারিত জানাইব। আজ থাক্।"

পত্র পড়িয়া প্রভাতের মাথা ঘুরিয়া গেল। মিছে কথা এ, ইন্দু পাপিষ্ঠা, ইন্দু অবিশ্বাসিনী, অসম্ভব এ।—ঘনঘন পত্র দিব বলিয়া এত বিলম্ব

করিয়াছে, তাই এ কথা! ইন্দুর কি ছেলেমানুষি! কি সরলতা! "আমায় লইয়া আর কি সুখী হইতে পারিবে?"—সেরেফ পাগলামি! কিন্তু তবু প্রভাতের মনের মেঘ কাটিল না। কি এক অজ্ঞাত অমঙ্গলের আশঙ্কায় তাঁর প্রাণ "আকুলি-ব্যাকুলি" করিতেছিল। "ইন্দু! ইন্দু! আমার ইন্দু! ইন্দু কি পাগল হইল!"

—

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

—০ঃঃ০—

প্রভাত ছুটী লইয়া ইন্দুর কাছে যাওয়াই স্থির করিয়াছিলেন, কিন্তু পরদিন তাঁর শ্বশুরের পত্রে জানিলেন, মন্মথ শ্বশুরবাটী হইয়া শীঘ্র কলিকাতায় পড়িতে আসিতেছে। এই সুযোগে ইন্দুকে আনা সহজে হইবে মনে করিয়া, প্রভাত তখনই শ্বশুরকে পত্র লিখিলেন। উত্তরে শ্বশুরও দিন স্থির করিয়া জানাইলেন। স্থিরীকৃত দিনে যথাসময়ে প্রভাত ষ্টেশনে উপস্থিত হইলেন। মন্মথও গাড়া হইতে নামিল। ইন্দু কই? প্রভাত অতিমাত্র আগ্রহে, মন্মথকে শুধাইলেন, "তোমার ঠাকুর-ঝি!" মন্মথ সংক্ষেপে বলিল, "তাঁর আসা হইল না।" "কেন?—"ঠিক বলিতে পারি না।" "সব ভাল ত?"—"হাঁ।"

এই সংক্ষিপ্ত উত্তরে প্রভাতের উদ্বেগ বাড়িল মাত্র। উদ্‌ভ্রান্তচিত্তে তিনি বাসায় ফিরিলেন। বা... ফিরিয়া দেখেন, ইন্দুর একখানি চিঠি। ইন্দু

শুধু লিখিয়াছে, "প্রিয়তম! একবার এস।" প্রভাতের আসন টলিল, সাহেবকে বলিয়া-কহিয়া কোনরূপে পাঁচদিনের ছুটী লইয়া সেইদিনই সন্ধ্যার ট্রেণে, প্রভাত ইন্দুর উদ্দেশে ছুটিলেন। পরদিন বেলা দশটার পর প্রভাত প্রসন্নপুরে পৌঁছিলেন। যাহাকে দেখিবার জন্য প্রভাত এত ব্যাকুল, সম্মুখে ওই যে সৌধ, ওই সৌধে প্রভাতের সেই প্রেমপ্রতিমা প্রতিষ্ঠিত। তবে আজ সেই সুখের মন্দিরে প্রবেশ করিতে প্রভাতের মন সহসা এত কাঁদিয়া কাঁদিয়া উঠিতেছে কেন? দূর হইতে চারু কিরূপে প্রভাতকে দেখিতে পাইয়াছিল। সে অমনি "প্রভাতবাবু এসেছে গো!" বলিতে বলিতে ছুটিয়া বাড়ীর মধ্যে গেল। ইন্দুর সহিত চোখোচোখি হইয়া চারু একমুখ হাসিয়া মাথা নাড়িতে নাড়িতে শাসাইল, "দিদি আজ!" বোধ হয় চারুর তখন মনে হইতেছিল, "দিদি আমায় এবার বড় জ্বালানই জ্বালিয়েছে, এখন আমিও তেমনি দাদ্ তুল্‌বো," তাই সংক্ষেপে এই শাসন বাক্য প্রয়োগ করিল। চারুর এই বালিকা-

সুলভ কল্পনা বুঝিয়া সকলেই হাসিয়া উঠিল, প্রভাতের আগমন-সংবাদে ইন্দুর মুখও প্রফুল্ল হইয়াছিল, কিন্তু "দিদি আজ!" এই কথায় কি জানি সহসা কেন সে প্রফুল্ল মুখকমল নিমেষে শুকাইয়া উঠিল।

রাধই করে থাক, আমি তোমায় ক্ষমা করিলাম।”
ইন্দু প্রভাতের নিষেধ শুনিল না। তবু বলিল,—
“না, শোন!” “না ইন্দু, না, শুনে আর কাজ
নাই! এস, অন্য কথা কই” বলিয়া প্রভাত ইন্দুর
সেই রোদন-লোহিত, অশ্রুসিক্ত, অনিন্দ্যসুন্দর
মুখখানি ধরিয়া বারবার চুম্বন করিলেন; তার পর,
অতি যত্নে চোখের জল মুছাইয়া, ইন্দুকে আপনার
পাশে বসাইলেন। অতি সাবধানে অন্য প্রসঙ্গ
পাড়িলেন, ক্রমে ইন্দুও সে সকল প্রসঙ্গে যোগ
দিতে আরম্ভ করিল, তাহার সেই মলিন মুখ
আবার যেন প্রফুল্ল হইল, নির্ব্বাণোন্মুখ দীপ আবার
জ্বলিয়া উঠিল! প্রভাত বুঝিলেন, তবে বুঝি বা
এখনকার মত মেঘ কাটিয়া গেল! এমন সময় কে
ডাকিল, “ইন্দু, চুল বাঁধ্‌বে এস!” “তবে যাই”
বলিয়া ইন্দু উঠিল, প্রভাতও উঠিয়া বিদায়-চুম্বন
দিলেন; এবং ইন্দুও প্রতিচুম্বন করিল; সে চুম্বন
বড় তপ্ত, বড় গাঢ়! কিন্তু সহসা কি মনে করিয়া
সরিয়া দাঁড়াইল, তার পর স্বামীর পানে চাহিয়া-
চাহিয়া ইন্দু চলিয়া গেল।

প্রভাত বাহিরে যাইতেছিলেন, সিঁড়ির ঘরে একটু দাঁড়াইয়া শুনিলেন, পাশের ঘরে চেনা গলায় কে বলিতেছে, "ইন্দু, আয় লো, তোর মাথা বেঁধে দি"; ইহার পরের চরণ প্রভাতের জানা ছিল, প্রভাত একটু হাসিয়া বাহিরে চলিয়া গেলেন। যাইতে যাইতে পথে, তাঁহার অঙ্গুলিস্থিত হীরকাঙ্গুরীয়ের প্রতি দৃষ্টি পাড়িল—এই যে হীরক, ইহা খাঁটি না নকল? ভাঙিয়া দেখিলে হয় না? নকল হয় হোক্, ভাঙিয়া কি লাভ? আমি ত জানি, ইহা খাঁটি। তবে সে ভুল ভাঙিয়া কাজ কি? প্রভাত এই ভাবিয়া আবার আপনার মন দৃঢ় করিলেন।

আর ইন্দু! ইন্দু চুল বাঁধিতে বাঁধিতে বড় অন্যমনস্ক হইতেছে। সেই ডাক্তার ঠাকুরুণদিদি, চুল বাঁধিয়া দিতে দিতে অনেক রঙ্গ করিতেছিলেন—কিন্তু ইন্দু আজ সে হাসিতামাসায় যোগ দিতে পারিতেছে না! ইন্দু যেন কি এক গভীর চিন্তায় মগ্ন! চুল বাঁধা শেষ হইলে, ঠাকুরুণদিদি,—

"সাদা মনে কালো ফিতেয় বেঁধে দিলাম চুল,
স্বামীর পায়ে মনটি রেখো হয় না যেন ভুল!"

বলিয়া বেশ করিয়া মুখখানি মুছাইয়া দিয়া, একটি 'টিপ্' পরাইয়া, ইন্দুর মুখে চুমো খাইলেন। ইন্দ বিষাদের হাসি হাসিল। ঠাকরুণদিদি বুঝিয়া গেলেন,—

"মুখের হাসি চাপ্‌লে কি হয়—
প্রাণের হাসি চোখে খেলে!"

বিংশ পরিচ্ছেদ।

---*---

সেই দিন সন্ধ্যার পর চারু তার ঘরে গিয়া দেখে—সর্ব্বনাশ! দেখিয়াই সে চীৎকার করিয়া উঠিল, "ওগো! তোমরা শীগ্গির এসো গো, দিদি কেমন কচ্চে!" চীৎকার শুনিয়া সকলে ছুটিয়া আসিলেন, দেখিলেন, ছিন্নকণ্ঠ পক্ষিণীর মত ইন্দু ভূমিশয্যায় পড়িয়া যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করিতেছে। ইন্দু কখন যে তার ঠাকুরমার কৌটা হইতে আফিং চুরি করিয়া খাইয়াছে—তাহা কেহ জানে না। "ওমা আমার কি হলো গো!" বলিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে মা ইন্দুর মাথা কোলে তুলিয়া লইলেন। তখন ডাক্তার ডাকিতে লোক ছুটিল। ইন্দু একবার কাতরদৃষ্টিতে মার দিকে চাহিয়া চোখের জল ফেলিল। তার পর চারুকে লক্ষ্য করিয়া ক্ষীণকণ্ঠে বলিল, "একবার ডাক্ চারু, একবার ডাক্!"

* * * * *

ধীরে ধীরে প্রভাত গৃহে প্রবেশ করিলেন।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

—•—

আজ বহুদিনের বিচ্ছেদের পর দম্পতির মিলন হইল। ইন্দুর সেই বিষাদ-মলিন মূর্ত্তি দেখিয়া প্রভাত ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ইন্দু, এমন দেখ্‌চি কেন?" ইন্দু কিছু বলিল না, স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া একটু বিষাদের হাসি হাসিল। ছিন্ন মেঘের কোলে সৌদামিনী যেমন হাসে, অনেক দিনের পর ইন্দু আজ তেমনই হাসিল। কিন্তু তখনই আবার জলভরা মেঘের মত গম্ভীর হইয়া উঠিল। প্রভাত আগ্রহভরে ইন্দুকে আলিঙ্গন করিতে যাইতেছিলেন, ইন্দু সরিয়া গেল; বলিল, "আমায় ছুঁয়োনা," প্রভাত অন্যরূপ বুঝিয়া একটু হাসিয়া ইন্দুকে কোলে টানিয়া লইলেন। তখন ইন্দুর হৃদয়ে তুমুল ঝটিকা বহিতেছিল। প্রভাত আবার স্নেহ-কম্পিত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বল ইন্দু, এমন দেখ্‌চি কেন? অমন করে, অপরাধীর মত চিঠিপত্রই বা লিখ্‌তে কেন? আর

মন্মথের সঙ্গে যেতেই বা আপত্তি কল্লে কেন?" প্রভাত দারুণ আগ্রহে, একবারেই তিনটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন ইন্দু আত্মহারা হইয়া, স্বামীর বুকে মুখ লুকাইয়া, কাঁদিল। পদস্খলিত ভক্ত যেমন ইষ্টদেবের সম্মুখে লুঠাইয়া লুঠাইয়া কাঁদে, ইন্দু তেমনি করিয়া কাঁদিল।

তার পর প্রকৃতিস্থ হইয়া, স্বামীর বাহুপাশ হইতে আপনাকে মুক্ত করিয়া ইন্দু সরিয়া দাঁড়াইল। দৃঢ়কণ্ঠে বলিল,—'তবে শোন।'

ইন্দুর সেই উন্মাদিনী মূর্ত্তি দেখিয়া প্রভাত মহাভীত হইয়াছিলেন, সমস্ত আলোচনা করিয়া, ইহাও তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, নিশ্চয় কি এক অঘটন ঘটিয়াছে। "আর বল্‌তে হবে না—ইন্দু আমি বুঝেছি," বলিয়া প্রভাত তাড়াতাড়ি আবার ইন্দুকে বুকে ধরিলেন।

"না—বুঝ নাই। বুঝিলে এ কালসাপিনীকে এমন আদর করিয়া বুকে লইতে না।" বলিয়া ইন্দু আবার কাঁদিয়া ফেলিল;—"যা বুঝি নাই, তা আর বুঝে কাজ নাই ইন্দু! তুমি যে অপ-

সকলে উঠিয়া গেল। উচ্ছ্বসিতকণ্ঠে প্রভাত বলিলেন, "ইন্দু! ইন্দু! এ কি?" "বলি" বলিয়া ইন্দু একখানি চিঠি প্রভাতের হাতে দিল, তার পর প্রভাতের পায়ে মাথা রাখিয়া, কাতরকণ্ঠে বলিল, "আমার বুকে দিনরাত নরকের আগুন জ্বল্‌ছে, এ পাপের বোঝা আমি আর বহিতে পারি নে,—তুমি আমায় ক্ষমা করে চরণে ঠাঁই দিলে, কিন্তু আমার জ্বালা নিভিল কই? আর বলিতে পারি না, চিঠিতে সব রইলো, আমার দশা যেন সবাই শোনে।"

মনের আবেগে, বহু কষ্টে, ইন্দু এই কয়টি কথা বলিল; তাহার কণ্ঠরোধ হইয়া আসিতেছিল, বলি বলি করিয়াও আর কিছু বলিতে পারিল না। ইন্দু তখন নির্ব্বাক্ হইয়া অশ্রুপূর্ণলোচনে স্বামীর মুখের পানে চাহিয়া রহিল। বৃন্তভ্রষ্ট ফুল্ল কুসুম যেমন কর্দ্দমস্পৃষ্ট হইয়া আকাশের পানে চাহিয়া চাহিয়া শুকাইয়া যায়, ধরণীলুণ্ঠিতা ইন্দুও তেমনই কাতর-দৃষ্টিতে স্বামীর পানে চাহিয়া প্রতিমুহূর্ত্তে শুকাইয়া উঠিতেছিল।

ক্রমে মৃত্যুযন্ত্রণায় ইন্দুর চক্ষু মুদিয়া আসিল। উদ্দামহৃদয়ে আকুলকণ্ঠে প্রভাত ডাকিল, "ইন্দু!" বাণবিদ্ধা হরিণী যেমন জীবনের শেষ মুহূর্ত্তেও বংশী-রবে শিহরিয়া উঠে, স্বামীর কণ্ঠস্বরে ইন্দু তেমনই শিহরিল! তার পর ধীরে ধীরে সেই বিবেকবিক্ষত, অনুতপ্ত প্রাণ দেহবিমুক্ত হইল।

সম্পূর্ণ।

উৎসর্গ পত্র।

যাঁহার যত্নে ও আগ্রহে বাল্যকালে বাঙ্‌লা সাহিত্যে আমার অনুরাগ জন্মে, যাঁহার উৎসাহে ও আদর্শে আমি কৈশোরে বাঙ্‌লারচনায় ব্রতী হই, যাঁহার অপার স্নেহে সংসারের নিদাঘমধ্যাহ্নেও এ জীবন স্নিগ্ধ, আমার সেই—

পূজনীয় অগ্রজ

শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র মজুমদার

মহাশয়ের শ্রীচরণকমলে

এই ক্ষুদ্র গ্রন্থ উৎসর্গ করিলাম।

কলিকাতা
১লা শ্রাবণ
১৩০৯।

শ্রীশৈলেশচন্দ্র মজুমদার।

একটি কথা।

কয়েক বৎসর অতীত হইল ইন্দুর শেষের কয়েকটি পরিচ্ছেদ কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত ভাবে ছোট গল্পের আকারে "সাহিত্যে" দিয়াছিলাম। শেষে ভিন্ন নামে এই গ্রন্থ "উৎসাহে" সমাপ্ত হয়। যাঁহার নির্ব্বন্ধে এই ক্ষুদ্র উপন্যাস সম্পূর্ণ করিয়াছিলাম, উৎসাহের প্রবর্ত্তক ও সম্পাদক অকপট সাহিত্যানুরাগী উদারহৃদয় আমার একান্ত স্নেহাস্পদ সেই প্রিয়দর্শন সুরেশচন্দ্র আর ইহলোকে নাই। জীবনের মধ্য-পথে পৌঁছিতে না পৌঁছিতে, জীবনের পবিত্র-ব্রত সমাপ্ত করিতে না করিতে, তিনি আত্মীয়-স্বজন বন্ধুবান্ধবদের কাঁদাইয়া লোকান্তরে প্রয়াণ করিয়াছেন। আজ এই উপন্যাসখানি গ্রন্থাকারে প্রকাশ করিবার দিনে তাঁহারই কথা বারবার মনে পড়িতেছে। তাঁহার সেরূপ আগ্রহ ভিন্ন হয় ত "ইন্দু" উপন্যাস গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইত না। আমার এ সন্তপ্ত হৃদয় সেজন্য এই অবকাশে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতেছে।

গ্রন্থকার।

গ্রন্থকারের অন্যান্য গ্রন্থ।

১। চিত্র-বিচিত্র—(১৫টি নক্সা ও ছোট গল্প একত্রে) ভাল কালি ও কাগজে ছাপা, উত্তম বাঁধাই ১।০

২। শোভা (উপন্যাস) শীঘ্র প্রকাশিত হইবে।

২০ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট্ মজুমদার লাইব্রেরীতে প্রাপ্তব্য।